পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে

ইসলামের সহজ পরিচয়

অধ্যাপক গোলাম আযম

উৎসর্গ

অনেক লেখক তাদের লেখা বই কারো না কারো নামে উৎসর্গ করেন। কেউ পিতা-মাতার নামে, কেউ কোনো বিখ্যাত লোকের নামে, কেউ প্রিয়জনের নামে, কেউ আদরের সন্তানদের নামে উৎসর্গ করে থাকেন।

আমার লেখা প্রিয় বইগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ প্রিয় বই হলো 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়'। বইটি যাদের জন্য লিখেছি, তাদের উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত আনন্দ ও আবেগের সাথে উৎসর্গ করলাম।

তারা কারা? তারা ঐসব মানুষ, যারা অল্পশিক্ষিত। তারা মাতৃভাষা কোনো রকমে পড়তে পারেন। তাদের পক্ষে অনেক বই পড়া সম্ভব নয়। বড় বই পড়তে তারা সাহস পান না; কঠিন ভাষা বুঝতে পারেন না। সহজ বাংলায় ছোট বা মাঝারি সাইজের বই পেলে তারা পড়েন। পড়ে মজা পেলে অন্যদেরকে পড়ে শোনান।

তারা দেশের কোটি কোটি জনগণের সাথেই গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করেন। জনগণের মধ্যে খুব কম লোকই বই পড়তে পারেন। যে কয়েকজন বই পড়তে পারেন, তারাই জনগণের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। তারাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচনে তারাই প্রার্থী হন। সকল নির্বাচনেই তারা জনগণকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেন।

জনগণের এ নেতাদের উদ্দেশ্যেই আমার অতি প্রিয় বইটি উৎসর্গ করলাম। তারা যে দলের লোকই হোন, ইসলাম সম্পর্কে তাদের জানার অধিকার আছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, রাসূল (স)-কে ভালোবাসেন এবং কুরআন মাজীদ-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। তারা যদি ইসলামের জ্ঞান লাভ করেন, তাহলে তাদের মাধ্যমেই জনগণের মধ্যে ইসলামের আলো পৌঁছবে। যারা বই পড়তে পারেন না তাদেরকে তারাই বইটি পড়ে শোনাবেন ও বোঝাবেন।

আল্লাহর দরবারে দোআ করি, যেন আমার এ আশা পূরণ হয়। আমীন!

গোলাম আযম
জুলাই, ২০০৬

www.pathagar.com

বইটির ইতিকথা

আমি অনেকদিন থেকে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম যে, সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সহজ-সরল ভাষায় দীন ইসলামের পরিপূর্ণ ধারণা একটিমাত্র মাঝারি আকারের বইয়ে পরিবেশন করা খুবই জরুরি। কোনো রকমে মাতৃভাষা পড়তে পারে এমন লোকও যাতে বইটি পড়লে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সন্তোষজনক ধারণা লাভ করতে পারে। এমনকি যারা বই পড়তে পারে না, তাদেরকে বইটি পড়ে শোনালে তারাও যেন তৃপ্তির সাথে দীনের আলো উপভোগ করতে পারে।

শুধু বাংলাদেশেই বর্তমানে কমপক্ষে তেরো কোটি জন্মগত মুসলমান রয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মাতৃভাষা পর্যন্ত পড়তে জানে না। উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও খুবই কম। যারা কোনো রকমে বাংলাভাষা পড়তে পারে তাদের জন্য অতি সহজ ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে এমন জ্ঞান পরিবেশন করতে চাই, যা তারা তৃপ্তির সাথে বুঝতে পারবে এবং যারা পড়তে জানে না তাদেরকেও পড়ে শোনানো দরকার মনে করবে।

আমি অবশ্য স্বল্পশিক্ষিতদের বোধগম্য ভাষায়ই লিখি; কিন্তু আমার লেখা উচ্চশিক্ষিতগণও অপছন্দ করেন না। তারাও অল্পশিক্ষিত লোকদের নিকট দীনের দাওয়াত দেন। হয়তো আমার লেখা এ দিক দিয়ে তাদের জন্যও সহায়ক হতে পারে।

আমি এমন একটি বই রচনা করতে চেয়েছি, যা থেকে জনগণ ইসলামের এ পরিমাণ জ্ঞান হাসিল করতে পারবে— যা তাদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ যোগাবে এবং অন্যদের নিকটও দীন ইসলামের আলো বিতরণ করার জন্য তাদের মধ্যে জযবা পয়দা করবে।

২০০৫ সালের এপ্রিলে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বরে লেখা সমাপ্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্নসাধ পূরণ হলো। যাদের উদ্দেশে লিখলাম তাদের পক্ষে অনেক বই পড়া অসম্ভব মনে করেই এক বইয়ে গোটা ইসলামকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

www.pathagar.com

ইসলামী গবেষণামূলক মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী'র সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ লেখাগুলোকে ২০০৫ সালের জুন থেকে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৯ কিস্তিতে প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করেছেন।

পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে বইটিতে আলোচনা করেছি। অর্থনীতির মতো কঠিন, সংস্কৃতির মতো সূক্ষ্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো জটিল বিষয়ে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে বোঝানো যে কত কঠিন, তা লিখতে গিয়ে টের পেলাম।

যাদের জন্য লিখলাম তাদের বোঝার মতো সহজ হয়েছে কি না, এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত সুধীজনের সার্টিফিকেট পেয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জানালাম। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাঁর মাহফিলসমূহে 'এক বই থেকে ইসলামকে শিখুন' বলে বইটির ঘোষণা দিয়ে থাকেন।

হাইস্পিড গ্রুপ অব কোম্পানিজ-এর চেয়ারম্যান একান্ত স্নেহভাজন কে. এম. মাহমুদুর রহমান বইটিকে ALL IN ONE আখ্যা দিয়ে ৫,০০০ কপি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন।

এ বই লেখার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়, আল্লাহর দরবারে এ দোআই করছি। বইটিকে আরো উন্নত করার জন্য যারা পরামর্শ দিয়েছেন তাদের প্রতি শুকরিয়া জানাই।

বইটি ২০০৫ সালের নভেম্বরে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ম মুদ্রণ শেষ হয়েছে। আল্লাহর রহমতে বইটির প্রচার আশাব্যঞ্জক। আল্লাহর দরবারে যেন বইটি কবুল হয়, এ দোআই চাই।

গোলাম আযম

জুন, ২০০৮

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়	১১
দুনিয়ায় নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য	১১
দীনদারী বনাম দুনিয়াদারী	১২
মুসলিম পরিবারে জন্মিলেই কি মুসলিম হয়ে যায়?	১২
মুসলিম পরিবারে পয়দা হওয়াও আল্লাহর মেহেরবানী	১৩
তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সরল অর্থ	১৪
ইসলাম শব্দের অর্থ	১৫
দীন শব্দের অর্থ	১৫
সব সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ নিয়ম-কানুন দিয়েছেন	১৬
ইসলাম কাকে বলে?	১৭
ইসলাম দু'রকম	১৭
এ দায়িত্বটাই খিলাফতের দায়িত্ব	১৭
মানুষের দুটো সত্তা	১৮
আল্লাহ যতকিছু সৃষ্টি করেছেন সেসবের পরিচয়	২০
মানুষের জন্য জ্ঞান জরুরি	২১
জ্ঞানের মূল উৎস কী কী	২১
ইসলাম কবুল করার নিয়ম	২২
মুসলিমের করণীয় কী?	২৪
মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কী?	২৪
বিশেষ জরুরি কথা	২৫
নামায ও রোযা কালেমার ওয়াদামতো চলার যোগ্য বানায়	২৫
নামাযের মাধ্যমে কালেমার ওয়াদা পালনের অভ্যাস হয়	২৬
এর উদ্দেশ্য কী?	২৬
নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না	২৭
খাঁটি নামাযীর ২৪ ঘণ্টার রুটিন	২৮
রোযা নাফ্‌সকে দমন করার হাতিয়ার	২৮
যাকাত ও হজ্জ	৩০
ইসলামের পাঁচটি ভিত	৩১

www.pathagar.com

আদম ও ইবলিসের কাহিনী ৩২
শয়তানের রাজত্ব বনাম আল্লাহর খিলাফত ৩৩
আল্লাহর খিলাফত কায়েমের মানে কী? ৩৪
ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর খিলাফত ৩৫
মানবদেহের ইসলাম ৩৬
প্রকৃতির জগতে কোনো অশান্তি নেই কেন? ৩৬
আল্লাহ দুনিয়াতেও শাস্তি দেন ৩৮
মযবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৩৯

ঈমান ৩৯
বিশ্বাস ছাড়া কি চলা যায়? ৪০
বিশ্বাস ও কর্ম দু'রকম হয় না ৪১
মুসলিম হতে হলে যা বিশ্বাস করা জরুরি ৪১
এ ৭টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪১
তাওহীদ-রিসালাত-আখিরাত ৪৩
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ৪৪
ঈমান কীভাবে দুর্বল হয়? ৪৬

ইলম ৪৮
কতটুকু ইলম ফরয? ৪৮
ওহীর নফল ইলম হাসিলের মূল্য কী? ৪৯
শরীআতে অন্যান্য বিদ্যার মূল্য আছে কি? ৪৯

আমল ৫০
মানুষের আমলের হিসাব মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয় না ৫১
সহীহ নিয়ত ছাড়া নেক আমলও কবুল হয় না ৫২

দীন ইসলামের কতক জরুরি বিষয়ে সঠিক ধারণা ৫৩
১. মুহাম্মদ (স)-এর সাথে মুমিনের সম্পর্ক কেমন? ৫৩
২. কুরআন কেমন কিতাব? ৫৫
৩. সবচেয়ে উঁচুমানের মুসলমান কারা? ৫৫
৪. দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী? ৫৬

www.pathagar.com

৫. ইবাদত কাকে বলে? ৫৬
৬. কুরআন ও হাদীস ৫৭
তিন রকম হাদীস ৫৮

আল্লাহর বিধান ৫৯

ব্যক্তিজীবন ৫৯

পারিবারিক জীবন ৬১
তালাক ৬৬
ইসলামে তালাকের নিয়ম ৬৭
পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক ৬৭

ধর্মীয় জীবন ৭১
তাওবা ৭৩

সামাজিক জীবন ৭৪

রাজনৈতিক জীবন ৭৭
মুসলিমজাতির রাজনীতি ৭৭
ইসলামী সরকারের ৪ দফা কর্মসূচি ৭৯
চরিত্রের গুরুত্ব ৮০
বর্তমান যুগে বিশ্বের সরকারগুলোর অবস্থা ৮২
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ১০টি মূলনীতি ৮৩
ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল ৮৪
ইসলামী সরকারকে নির্বাচিত হতে হবে ৮৪
মজলিসে শূরা ৮৪
সরকারকাঠামো ৮৫
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার ৮৬
নির্বাচনপদ্ধতি ৮৭
ইসলামে ভোটের গুরুত্ব ৮৮

অর্থনৈতিক জীবন ৯০
আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৯১
এসব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে কেন? ৯১

www.pathagar.com

প্রাণিজগতের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ৯২
মানুষ রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পায় কেন? ৯৩
এ প্রশ্নের সঠিক জবাব ৯৪
একটা সহজ উদাহরণ ৯৫
দুনিয়ার সব মানুষ একই পরিবার ৯৫
আল্লাহর পরিবারের কী দশা? ৯৭
ইনসাফের কথা ৯৮
দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৯৯
দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৯৯
পুঁজিবাদী অর্থনীতি ১০০
যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে ১০২
ইসলামী সরকারের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ১০৩
বাংলাদেশে ঘুষের কুফল ১০৫
সাংস্কৃতিক জীবন ১০৬
মুসলিম ও অমুসলিম জীবনে তফাৎ কোথায়? ১০৭
সংস্কৃতি কাকে বলে? ১০৮
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১০৯
বাঙালি সংস্কৃতি ১১০
আন্তর্জাতিক জীবন ১১১
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধরন ১১১
যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামী বিধান ১১২
ইসলামের প্রতি মুসলিমদের কর্তব্য ১১৩
জিহাদ ১১৪
ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ ১১৫
রাসূল (স) কীভাবে কাজ শুরু করেছিলেন? ১১৬
রাসূল (স) মযবুত সংগঠন গড়ে তুললেন ১১৮
মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন ১১৮
বাংলাদেশে কি ইসলামের বিজয় সম্ভব? ১১৯
ইসলামী সরকার মানে সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন ১২০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়

সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামকে শুধু একটা ধর্ম হিসেবেই জানে। যারা নিয়মিত নামায-রোযা করে তাদের মধ্যেও অনেকে বাস্তব জীবনে ইসলামের কোনো প্রভাব থাকতে পারে এমন ধারণা রাখে না। জনগণ আলেমসমাজ থেকে ইসলামের যে আলো পেয়েছে এবং তাঁরা দীন ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে যেটুকু ধারণা দিয়েছেন, ঠিক ততটুকুই তারা জানে।

মানুষের জীবনের বহু দিক রয়েছে— ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে এসব দিক থেকে ধর্মীয় দিককে আলাদা মনে করা হয়। অন্যান্য ধর্মে অবশ্য ঐ সব দিক থেকে ধর্ম আলাদাই, কিন্তু ইসলামে ধর্মীয় দিকটি অন্যান্য দিক থেকে আলাদা নয়; বরং সকল দিকের উপরই ধর্মীয় দিকের এমন ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যে, মনে হয় সকল দিকই ধর্মীয় দিকের অধীন রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধর্মীয় দিকটিই গোটা মানবজীবনের চালিকাশক্তি। আল্লাহ তাআলার দাসত্ব, রাসূল (স)-এর আনুগত্য ও আখিরাতের জবাবদিহিতা– এ তিনটি ধর্মীয় নীতি হলেও মুসলমানদের গোটা জীবনের সাথেই এগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মুমিনের জীবনে দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে কোনো তফাৎ নেই। ঐ তিনটি ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী কাজ করলে দুনিয়াদারী বলে গণ্য সকল কাজও দীনদারীতে পরিণত হয়।

দুনিয়ায় নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য

মানুষকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু করতে হয়, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যাবতীয় আইন-কানুন পাঠিয়েছেন; কিন্তু এসব বিধি-বিধান মেনে চলতে তিনি মানুষকে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা তাঁর দেওয়া আইন-বিধান মেনে চলবে তারা দুনিয়ায়ও শান্তি ভোগ করবে এবং আখিরাতেও পুরস্কার পাবে। আর যারা তা মানবে না এবং মানুষের মনগড়া নিয়ম মেনে চলবে তারা দুনিয়ায়ও অশান্তি ভোগ করবে, আখিরাতেও শাস্তি পাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীগণ মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী বানাতে আসেননি; বরং তাঁরা মানুষকে দুনিয়ার সকল দায়-দায়িত্ব আল্লাহর তৈরি নিয়মে পালন করার শিক্ষা দিতে এসেছেন। দুনিয়ার সব কাজ নবীদের শেখানো নিয়মে করলে দুনিয়াদারীর কাজও দীনদারী হিসেবে গণ্য হয় এবং সবই ইবাদতে পরিণত হয়।

দীনদারী বনাম দুনিয়াদারী

এক হাদীসে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো লোক ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর ঘুমিয়ে গেল। সে যদি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তাহলে তার সে ঘুমটাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর দেওয়া নিয়মে ঘুমালে ঘুমও ইবাদতে পরিণত হয়। এভাবেই আল্লাহর দেওয়া নিয়মে বিয়ে-শাদি, ঘর-সংসার, রুজি-রোজগার, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-দাওয়া এমনকি পেশাব-পায়খানা করাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাই খাঁটি মুমিনের পার্থিব জীবনের সব কাজকর্মই দীনদারী।

সুতরাং দীন ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু কতক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। হিন্দুরা কতক পূজা-উপাসনা ও উপবাসের মাধ্যমে ধর্ম পালন করে। খ্রিস্টানরা প্রতি রোববার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে। এসব পূজা-উপাসনার সাথে দুনিয়ার অন্য সব কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম এ জাতীয় কোনো ধর্মই নয়। ইসলামের ধর্মীয় কাজগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ায় জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে মোটেই আলাদা নয়।

মুসলিম পরিবারে জন্মিলেই কি মুসলিম হয়ে যায়?

এই যে ইসলামের এ চমৎকার পরিচয় তা আমাদের সমাজের খুব কম লোকেরই জানা আছে। যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে তাদের সবারই ইসলামের এ সুন্দর পরিচয় জানা খুবই জরুরি। ইসলামকে এভাবে না জানলে কেমন করে খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে? আর খাঁটি মুসলমান হতে না পারলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে দোযখ থেকে নাজাত পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।

লোকেরা মনে করে যে, মুসলিম পরিবারে জন্মিলেই মুসলিম হয়ে যায়—এ ধারণা একেবারেই ভুল। মুসলমানের সন্তানও কাফির হয়ে যেতে পারে। আবার কাফিরের সন্তানও খাঁটি মুসলমান হতে পারে। অতীতকালে কাফিরের সন্তানও নবী হয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর কাফির ছিল। আবার নূহ (আ)-এর এক ছেলেও কাফির ছিল। জন্মগতভাবে কেউ মুমিন বা কাফির হয়

www.pathagar.com

না। মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো ঈমান। ঈমান আনা ও না আনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ঈমান বা বিশ্বাস মনের ব্যাপার। মনের উপর জোর খাটে না। তাই ঈমান আনার জন্য জোর করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগানোর বয়স হয় তখন নিজের ইচ্ছায় কাফিরের সন্তানও ঈমানদার হয়ে যেতে পারে, আবার মুমিনের সন্তানও কাফির হয়ে যেতে পারে। মুসলিম হওয়ার জন্য কতক জরুরি গুণের প্রয়োজন। সর্বপ্রথম তাকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী হতে হবে। এরপর তাকে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের কিছু ইলম হাসিল করতে হবে এবং ঈমান ও ইলম অনুযায়ী মুসলিম চরিত্র গঠন করার মতো আমল করতে হবে।

কাফিরের কোনো সন্তান যদি ঈমান, ইলম ও আমলের গুণের কারণে মুসলিম হয়, তাহলে কোনো মুসলিমসন্তানের মধ্যে এসব গুণ না থাকলে তাকে কী কারণে আল্লাহ মুসলিম হিসেবে গণ্য করবেন?

একজন ডাক্তারের সন্তান যদি ডাক্তারি বিদ্যা না শেখে, তাহলে ডাক্তারের সন্তান বলেই কি তাকে কেউ ডাক্তার বলে স্বীকার করবে? কোনো মাস্টারের মূর্খ সন্তান যদি নিজেকেও মাস্টার বলে দাবি করে তাহলে কি কেউ এ দাবি মেনে নেবে?

মুসলিম পরিবারে পয়দা হওয়াও আল্লাহর মেহেরবানী

আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে মুসলমানের ঘরে পয়দা না করতেন তাহলে আমার নিজের চেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করার কোনো সুযোগ পেতাম কি না—জানি না। তাই আল্লাহ তাআলার বিরাট মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে পয়দা করেছেন। আমার পিতা যদি আলেম না হতেন এবং তিনি যদি মুসলিম নামধারী হয়েও ঈমান, ইলম ও আমলের ধার না ধারতেন, তাহলে আমাকে তিনি ছোট সময় থেকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতেন না। আমাকে আলেমের ঘরে পয়দা করাটাও মা'বুদের বিরাট মেহেরবানী।

তাহলে বোঝা গেল, যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, তাদেরকেও আল্লাহর দরবারে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য ঈমান, ইলম ও আমলের চর্চা করতে হবে। যারা লেখাপড়া জানে না, তাদেরকেও যেমন আয়-রোজগার করতে হয়, ঘর-সংসার করতে হয়, তেমনি মুসলিম হওয়ার জন্যও তাদেরকে চেষ্টা করতে

www.pathagar.com

হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুনিয়াদি জ্ঞান হাসিল করতে হবে—যাতে মুমিন ও মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দরবারে গণ্য হওয়া যায়। তা না হলে আখিরাতে কী দশা হবে সে চেতনাও তারা হারিয়ে ফেলবে।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সরল অর্থ

ঈমানের মূল বিষয়কে ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বলা হয়। মুসলমানদের জীবনের সকল দিক এ তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। কালেমা তাইয়েবা لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর প্রথম অংশ তাওহীদ এবং দ্বিতীয় অংশ রিসালাত। এ কালেমা বেহেশতে যাওয়ার কোনো মন্ত্র নয়। না বুঝে শুধু এ কালেমা উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে বলে মনে করা একেবারেই ভুল।

যে ব্যক্তি এ কালেমা বুঝে-শুনে কবুল করে, সে আসলে তার জীবনের নীতি বা পলিসি ঘোষণা করে। প্রথম অংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা সে ঘোষণা করে—"আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুমমতো সবকিছু করব এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী আর কারো হুকুম মানব না।" দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে সে ঘোষণা করে— "মুহাম্মদ (স) যেভাবে যে তরীকা বা নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ নিয়মেই আল্লাহর হুকুম পালন করব। তাঁর তরীকা ছাড়া আর কারো তরীকা আমি মানব না।"

মুমিনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল দিকে যা কিছু করতে হয় তা সবই এ দুটো নীতি অনুযায়ীই করতে হবে। এছাড়া দুনিয়ায় যা কিছু করা হয় তার হিসাব আদালতে-আখিরাতে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা সকল কাজের হিসাব নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন— এ বিষয়ে পূর্ণ ইয়াকীন রেখেই মুমিনকে দুনিয়ার সবকিছু করতে হয়।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মুমিনের জীবনে ধর্মীয় দিক অন্য সব দিক থেকে আলাদা নয়; জীবনের সকল দিকই ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী চলবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত মুমিনের জীবনের আসল চালিকাশক্তি।

www.pathagar.com

اِسْلَامٌ (ইসলাম) শব্দের অর্থ

ইসলাম আরবী শব্দ। এর অর্থ আত্মসমর্পণ। আত্ম মানে নিজ, সমর্পণ মানে স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দেওয়া। আত্মসমর্পণ অর্থ– নিজেকে অন্য কারো অধীন করে দেওয়া।

কুরআন ও হাদীসে اِسْلَامٌ (ইসলাম) শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ বোঝানো হয়েছে। আর যে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে مُسْلِمٌ (মুসলিম) বলা হয়। এর সহজ অর্থ হলো নিজের মর্জি ও ইচ্ছামতো না চলে আল্লাহ তাআলার হুকুমমতো চলা। যে এভাবে চলে সে-ই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।

ইসলাম শব্দ থেকেই اَسْلَمَ (আসলামা) শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ সে ইসলাম কবুল করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। এভাবেই اَسْلَمْتُ মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বা আত্মসমর্পণ করলাম। যেমন– ইবরাহীম (আ)-এর কথা কুরআনে আছে, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ্যাৎ "আমি সারাজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।" (সূরা বাকারা : ১৩১)

ইসলাম শব্দের আরেকটি অর্থ হলো শান্তি। 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থ আপনার উপর শান্তি নাযিল হোক। আস্‌সালাম ও ইসলাম একই ক্রিয়ামূলের শব্দ। আল্লাহর হুকুমমতো চললেই শান্তি পাওয়া যায়। সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি পেতে হলে ইসলামের বিধানমতো চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম।

دِيْنٌ (দীন) শব্দের অর্থ

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন (হিসেবে গণ্য)।" সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে দীন হিসেবে দিয়ে খুশি হলাম।"

www.pathagar.com

এ দুটো আয়াতে ইসলামকে 'দীন' বলা হয়েছে। আমরা 'দীন ইসলাম' কথাটি বলেও থাকি। অনেকেই দীন ইসলামের বাংলা অর্থ 'ইসলাম ধর্ম' মনে করে। এটা একেবারেই ভুল অর্থ। 'দীন' শব্দের অর্থ না জানার কারণেই এ ভুল করা হয়।

'দীন' অর্থ যদি 'ধর্ম' মনে করা হয় তাহলে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতোই একটা ধর্ম বলে বোঝা যাবে। ইসলাম শুধু মানুষের ধর্মীয় দিকের বিধান দেয়নি, জীবনের সবদিকের বিধানই ইসলাম দিয়েছে। তাই 'ইসলাম ধর্ম' কথাটি সঠিক নয়। 'আল্লাহ' শব্দের যেমন কোনো অনুবাদ দরকার হয় না, তেমনি আরবী 'দীন' শব্দেরও অনুবাদের দরকার নেই। আমরা 'দীন ইসলাম'ই বলব। যেহেতু 'দীন' শব্দের অর্থ 'ধর্ম' বললে আসল অর্থ বোঝা যায় না, তাই 'ইসলাম ধর্ম' কথাটি বলা ঠিক নয়।

কিন্তু ইসলামকে যখন আল্লাহ 'দীন' বলেছেন, তখন দীন অর্থ জানা খুবই জরুরি। 'দীন' শব্দের আসল অর্থ আনুগত্য করা বা মেনে চলা। আমরা বাপ-মায়ের কথা মেনে চলি। দেশের আইন মেনে চলি। আল্লাহকে মেনে চলাই হলো দীন। আর এ দীনের নাম আল্লাহ-ই রেখেছেন 'ইসলাম'। আল্লাহকে মেনে চলার জন্য ইসলাম নামে মানুষকে যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান তিনি দিয়েছেন তা-ই 'দীন ইসলাম'।

সব সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ নিয়ম-কানুন দিয়েছেন

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেমন বিধি-বিধান দিয়েছেন, তেমনি যত কিছু পয়দা করেছেন ছোট-বড় প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই বিধান তৈরি করেছেন। একটা ঘাসের বেঁচে থাকার জন্য কী কী দরকার তা তিনিই ফায়সালা করে দিয়েছেন। পিঁপড়া থেকে হাতি পর্যন্ত সকল জীব, এটম (পরমাণু) থেকে সূর্য পর্যন্ত সকল বস্তুই কতক নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এসব নিয়ম কে বানিয়েছেন? কোনো সৃষ্টি কি এসব নিয়ম নিজে বানাতে পারে? মানুষের শরীরে যত নিয়ম আছে– রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস নেওয়ার নিয়ম, প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ম, ঘুমের নিয়ম ইত্যাদি কি মানুষ নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে?

পশু-পাখি, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, ধুলা-বালি পর্যন্ত আল্লাহর বানানো নিয়ম মেনে চলছে। এদের কারো ঐ নিয়ম অমান্য করার শক্তি নেই। বস্তু হোক আর প্রাণীই হোক কেউ নিজের মর্জিমতো চলার ক্ষমতা রাখে না। স্বাধীনভাবে চলার সাধ্য থাকলে একই নিয়মে চলতে বাধ্য হতো না।

www.pathagar.com

ইসলাম কাকে বলে?

এর সহজ উত্তর হলো, সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা যে নিয়ম-কানুন বানিয়েছেন তারই নাম ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম তিনি দিয়েছেন তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। সবার জন্য একই নিয়ম তিনি দেননি। যার জন্য যে নিয়ম দিয়েছেন সে নিয়মটাই তার ইসলাম।

মানুষের জন্য যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান তিনি দিয়েছেন তা মানুষের ইসলাম। সূর্যের জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা সূর্যের ইসলাম। পানির জন্য দেওয়া বিধান পানির ইসলাম। এভাবে ছোট-বড় সব জিনিস ও জীবেরই নিজস্ব ইসলাম রয়েছে।

ইসলাম দু'রকম

মানুষের ইসলাম ও অন্যান্য সৃষ্টির ইসলামের মধ্যে দু'দিক দিয়ে বেমিল আছে। যেমন–

১. মানুষের ইসলাম নবীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অন্যান্য সৃষ্টির ইসলাম নবীর কাছে পাঠানো হয়নি। এমনকি মানুষের শরীরের জন্য যে ইসলাম তা-ও নবীর মাধ্যমে আসেনি। আল্লাহ তাআলা মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির ইসলাম নবীর মাধ্যমে না পাঠিয়ে প্রত্যেক সৃষ্টির উপর তার জন্য তৈরিকৃত ইসলাম তিনি নিজে সরাসরি চালু করেন।

২. নবীর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে ইসলাম পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নিজে সরাসরি চালু করেন না। যদি তিনি সরাসরি চালু করতে চাইতেন, তাহলে নবী না পাঠিয়ে অন্যান্য সৃষ্টির ইসলামের মতোই মানুষের ইসলামও তিনি নিজেই জারি করতেন। তা না করে তিনি মানুষের ইসলাম নবীর কাছে পাঠিয়ে নবীকেই তা চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের ইসলাম আল্লাহ নিজে চালু করবেন না বলেই নবীর উপর সে দায়িত্ব দিয়েছেন।

এ দায়িত্বটাই খিলাফতের দায়িত্ব

ইসলাম আল্লাহর দেওয়া বিধান। তিনি নিজে তা জারি না করে তাঁর পক্ষ থেকে জারি করার দায়িত্ব নবীকে দিয়েছেন। কারো পক্ষ থেকে অন্য কেউ কোনো কাজ করলে তাকে প্রতিনিধি বা নায়েব বলা হয়। যার পক্ষ থেকে কাজটি করা হয় তিনি হলেন মনিব বা মালিক। খলীফা বা প্রতিনিধি তো মালিক নয়; মালিকের

www.pathagar.com

মর্জিমতোই প্রতিনিধিকে কাজ করতে হয়। খলীফা বা প্রতিনিধির কাজটিকেই খিলাফত বলা হয়।

প্রতিনিধিকে আরবীতে খলীফা বলে। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যে ইসলাম রাসূল (স)-এর নিকট পাঠালেন তা তিনি খলীফা হিসেবে চালু করার দায়িত্ব রাসূল (স)-কেই দিলেন। আল্লাহ নিজে যখন জারি করবেন না, তখন জারি করার দায়িত্ব তো অন্য কাউকেই পালন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন, "তিনি মানুষকে দুনিয়ায় খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্যই পয়দা করেছেন।" তাই যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর উপর ঈমান আনবে, তাকেও ঐ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঐ দায়িত্ব পালন না করলে কেউ-ই আল্লাহর খলীফা হিসেবে গণ্য হবে না।

এখানে একটা বড় কথা বুঝতে হবে— আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র খলীফা হিসেবেই পাঠিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মালিক বা মনিব হওয়ার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। যদি কোনো মানুষ আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালন করতে না চায়, তাহলে সে যা করবে তাতে সে শয়তানের খলীফা বলেই গণ্য হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান যে পালন করে না সে অন্য যে বিধানই মেনে চলে, তা শয়তানের বিধান হিসেবেই কুরআন মাজীদের সূরা আল বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়ায় মানুষকে খলীফাই হতে হবে; অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। হয় আল্লাহর খলীফা, আর না হয় শয়তানের খলীফা।

মানুষের দুটো সত্তা

মানুষের শরীর তার আসল সত্তা নয়। আসল মানুষ হলো রূহ। মায়ের পেটে মানুষের শরীরটা তৈরি হওয়ার অনেক আগে আসল মানুষটি পয়দা হয়েছে। কুরআনের মতে পয়লা মানুষ আদমের দেহ তৈরি হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে তাঁর রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দিলেন। আল্লাহ নিজে যে জিনিসটা ফুঁ দিয়ে দিলেন সেটাই আসল মানুষ। কুরআন আরো বলে যে, আদমের পিঠ থেকে সকল রূহকে একসাথে পয়দা করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হবে সবাইকে এক সাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ায় কাউকে আগে কাউকে পরে পাঠানো হয়।

এ রূহ কোনো বস্তু নয়। এ রূহের কারণেই মানুষ কোন্‌টা ভালো এবং কোন্‌টা মন্দ তা বুঝতে পারে। মানুষ যখন কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে তখন মনে খারাপ লাগে। এটাকে আমরা বিবেক বলি। এটা ভালো ও মন্দের চেতনা।

www.pathagar.com

এটাকে নৈতিক চেতনা বলা হয়। ভালো-মন্দের ধারণা থেকেই এ চেতনা সৃষ্টি হয়। এটাই আসল মানুষ এবং এটাই মনুষ্যত্ব। এ কারণেই খুব বেশি মন্দ চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, ঐ লোকটা মানুষই নয়; পশুর চেয়েও মন্দ। কুরআনেও এ রকম লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এরা পশুর মতো; বরং পশুর চেয়েও অধম।"

মানুষের দেহসত্তাটি নৈতিক সত্তা নয়; বস্তুসত্তা মাত্র। আমরা যেসব জিনিস খাই সেসবের মধ্যে যেসব বস্তুসত্তার উপকরণ রয়েছে তা দিয়েই মানুষের শরীর তৈরি হয়েছে। এ কারণেই এসব খাবার দেহের মধ্যে খাপ খায়। মায়ের পেটে এ দেহ তৈরি হওয়ার পর একসময় তাতে রূহকে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হয়।

দেহের দাবিগুলোকে কুরআনে নাম দেওয়া হয়েছে 'নাফ্স'। দেহের দাবি হলো খিদা লাগলে খাবার চাওয়া, পিপাসা লাগলে পানি চাওয়া, গরম লাগলে ঠাণ্ডা চাওয়া, যা সুন্দর তা-ই দেখতে চাওয়া, যা শুনতে মিষ্টি তা-ই শুনতে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে সূরা আল বাকারার ২৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন। তাই যত কিছু ভোগ করার জিনিস আছে, তার সবই দেহ বা নাফ্স পেতে চায়। এসবের দিকে দেহের বিশেষ ঝোঁক আছে।

পশুর ভালো-মন্দের চেতনা নেই। মানুষের দেহটাও পশুর মতোই। কারণ, এরও নৈতিক চেতনা নেই। হাদীসে দেহটাকে ঘোড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, ঘোড়ায় চড়ে সে যদি লাগাম কষে ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে অল্প সময়ে অনেক দূরে যেতে পারবে; কিন্তু ঘোড়া যদি নিজের মর্জিমতো চলে তাহলে সওয়ারীর মহাবিপদ। তেমনিভাবে রূহ যদি শরীআতের লাগাম লাগিয়ে নাফ্সকে চালাতে পারে তবেই মানুষ সফল হয়। আর যদি না পারে তাহলে সে পশুর চেয়েও অধম হতে বাধ্য হয়।

আমরা সবাই এ বিষয়ে সাক্ষী। আমার নাফ্সের দাবিতে যখন আমি কোনো মন্দ কাজ করতে চাই, আমার রূহ (বিবেক বা নৈতিক চেতনা) তখন আপত্তি জানায়। রূহ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে নাফ্সকে দমন করতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি রূহ দুর্বল হয়, তাহলে মন্দ কাজ থেকে ফেরাতে পারে না।

নাফ্স ও রূহের মধ্যে এ লড়াই চলার কারণেই মানুষের নাফ্সের তিন রকম অবস্থা হয় বলে কুরআনে বলা হয়েছে। যেমন–

www.pathagar.com

১. **নাফ্‌সে আম্মারাহ (১৩ পারার পয়লা আয়াত) :** নাফ্‌স ও রূহের লড়াইয়ে যদি নাফ্‌স সব সময় জয়ী হয় এবং সব সময়ই রূহ হেরে যায় তাহলে এ নাফ্‌সকে 'নাফ্‌সে আম্মারাহ' বলা হয়।

২. **নাফ্‌সে লাওয়ামাহ (সূরা কিয়ামার ২ নং আয়াত) :** এ অবস্থা তখন হয়, যখন এক সময় রূহ জিতে যায় আবার এক সময় নাফ্‌স জিতে যায়।

৩. **নাফ্‌সে মুতমাইন্নাহ (সূরা আল ফাজরের ২৭ নং আয়াত) :** এ অবস্থা তখন হয়, যখন রূহ সবসময় জয়ী হয় এবং নাফ্‌স সবসময় পরাজিত হয়।

ইসলাম মানুষকে এমন শিক্ষাই দেয়, যাতে তার রূহ শক্তিশালী হয় এবং নাফ্‌সের উপর জয়ী হতে পারে। নামায-রোযার উদ্দেশ্যও এটাই।

আল্লাহ যতকিছু সৃষ্টি করেছেন সেসবের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা কত কিছু পয়দা করেছেন— তা হিসাব করার সাধ্যও কারো নেই। আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করে তাদের পরিচয় জানতে পারি :

১. **প্রাণহীন সৃষ্টি :** যেমন– ইট, পাথর, বালি, চাঁদ, সুরুজ, তারা ইত্যাদি। এসবের মধ্যে জীবন নেই। তাই এরা মরেও না।

২. **প্রাণী বা জীব :** এদের জীবন আছে বলে মরণও আছে।

প্রাণী আবার দু'রকম :

১. যেসব প্রাণীর ভালো-মন্দ বোঝার নৈতিক চেতনা আছে। যেমন– ফেরেশতা, জিন ও মানুষ।

২. যেসব প্রাণীর ঐ চেতনা নেই। ফেরেশতা, জিন ও মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের নৈতিক চেতনা নেই।

ফেরেশতা নূরের তৈরি, জিন 'নার' বা আগুনের তৈরি আর মানুষ মাটির তৈরি।

ফেরেশতাদের ভালো-মন্দের চেতনা থাকলেও তারা শুধু যা ভালো তা-ই করতে পারে, যা মন্দ তা করার ইখতিয়ার কিংবা ক্ষমতা তাদের নেই। মন্দ করার ক্ষমতা নেই বলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দরকার হবে না। আর বাধ্য হয়ে তারা ভালো কাজ করে বলে তাদের কোনো বাহাদুরী নেই। তাই তারা পুরস্কারও পাবে না।

জিন ও মানুষকে ভালো ও মন্দ দু'রকম কাজ করারই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই ভালো কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করলে তারা শাস্তির যোগ্য হয়। আর মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ না করে ভালো কাজ করাটা

www.pathagar.com

তাদের কৃতিত্ব। তাই তারা কৃতিত্বের বদলায় পুরস্কার পাবে। এদিক দিয়ে জিন ও মানুষের মধ্যে মিল থাকলেও একটি দিক দিয়ে জিনের চেয়ে মানুষের মর্যাদা আলাদা। তা হলো, মানুষকে আল্লাহ তাআলা খলীফার দায়িত্ব দিয়েছেন; জিনকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব মানুষকে দেওয়ার কারণেই জিন জাতির ইবলিস হিংসা করে শয়তানে পরিণত হয়।

মানুষের জন্য জ্ঞান জরুরি

জ্ঞান মানে জানার বিষয়। মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য যত জীব আছে, তাদের যা কিছু জানা দরকার সেজন্য নিজেদের চেষ্টা করা লাগে না। আল্লাহ তাদের জন্য যে নিয়ম-কানুন বানিয়েছেন তা তিনি নিজেই তাদেরকে শিখিয়ে দেন। তাই তাদেরকে চেষ্টা করে কিছুই শিখতে হয় না। তাদের জন্য কোন্‌টা দরকার, কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ— এর কোনোটাই অন্যদের কাছ থেকে জানতে হয় না। মানুষকে চেষ্টা করে সাঁতার শিখতে হয়। হাঁসকে আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই সাঁতার শিখিয়ে দেন।

মানুষকে নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করতে হয়। তাকে জানতে হয় যে, কোন্‌টা কীভাবে কখন করা দরকার। তাকে নিজের ইচ্ছায় ফায়সালা করতে হয় যে, সে আল্লাহর খলীফা হতে চায়, নাকি শয়তানের খলীফা। খিলাফতের এ ইখতিয়ার থাকার কারণেই তাকে নিজের ইচ্ছায় সবকিছু জানার চেষ্টা করতে হয়।

কুকুর মানুষের পায়খানাও খায়; কিন্তু কুকুরের বাচ্চা কখনো নিজের পায়খানা মুখে নেয় না। মানব-শিশু জানার অভাবে নিজের পায়খানাও মুখে দিতে পারে। তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে জ্ঞান হাসিল করার চেষ্টা করতে হয়।

জ্ঞানের মূল উৎস কী কী

জ্ঞান তো তালাশ করতেই হবে। কোথা থেকে তা পাওয়া যায় তাও তো জানা জরুরি। যেখান থেকে জ্ঞান হাসিল করা যায় তাকেই জ্ঞানের উৎস বলে। কোন্ কোন্ উৎস থেকে জ্ঞান যোগাড় করতে হবে সর্বাগ্রে তা জানা দরকার। জ্ঞানের উৎস চারটি। যথা– ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইলহাম ও ওহী। এ উৎসগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা খুবই জরুরি।

ইন্দ্রিয় : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চামড়া— এ পাঁচটির সাহায্যে মানব-শিশু পয়লা জ্ঞান লাভ করে। এটা হলো সরাসরি জ্ঞান। যা দেখা যায়, শোনা যায়, যার গন্ধ পাওয়া যায়, স্বাদ নেওয়া যায় তা সবই সরাসরি জ্ঞান।

www.pathagar.com

বুদ্ধি : ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সামান্য জ্ঞানই হাসিল করা যায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান পায়। বুদ্ধি মানে যুক্তি বা কার্যকারণ। যেমন– চোখ দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেল। বুদ্ধি বলে দিল, সেখানে আগুন লেগেছে; চোখের আগুন দেখার প্রয়োজন হয়নি। যুক্তি বলে দিল যে, আগুন হলেই ধোঁয়া হয়। তাই আগুন না দেখেও বুদ্ধি বলে দিল, আগুন লেগেছে। আরবীতে বুদ্ধিকে 'আক্‌ল' বলে।

ইলহাম : ইলহাম শব্দটি আরবী। সহজ বাংলায় এর অর্থ পাওয়া গেল না। ইংরেজিতে এ উৎসটিকে Intuition বলা হয়। এর অর্থ অভিধানে লেখা হয়েছে 'স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান'। যে জ্ঞান চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা করা ছাড়া হঠাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য এ রকম জ্ঞান তারাই পায়, যারা চিন্তা-সাধনা করে। কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ কোনো কোনো সময় এমন বিষয়েও ইলহামী জ্ঞান পান, যে বিষয়ে তাঁরা চেষ্টা-সাধনা করেননি।

ওহী : আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের নিকট যে জ্ঞান আসে, তাকেই ওহীর জ্ঞান বলা হয়। ওহীর জ্ঞান আল্লাহর নিজের ভাষায়ও আসতে পারে। যেমন– কুরআন মাজীদের ভাষা। নবী-রাসূলের মনে আল্লাহ তাআলা ভাষা ছাড়াও জ্ঞান বা বুঝ দেন, যা তাঁরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন। নবী-রাসূলগণ নিজের মনগড়া জ্ঞান দান করেন না। তাঁরা যে জ্ঞান দান করেন তা ভাষাসহ বা ভাষাছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জ্ঞানই হলো ওহীর জ্ঞান।

জ্ঞানের এ চার রকমের উৎসের মধ্যে একমাত্র ওহীর জ্ঞানেই কোনো ভুল থাকে না। আল্লাহর তো ভুল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছ থেকে নবীর নিকট আসা জ্ঞানও অবশ্যই নির্ভুল।

কিন্তু বাকি তিনটি উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান শুদ্ধও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। তাই ঐ তিনটির সাহায্যে পাওয়া জ্ঞান ওহীর জ্ঞানের মাপকাঠিতে যাচাই করেই জানতে হবে– কোন্‌টা শুদ্ধ এবং কোন্‌টা ভুল। ওহীর জ্ঞানই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চেনার একমাত্র মাপকাঠি।

ইসলাম কবুল করার নিয়ম

কোনো লোক যদি ইসলাম কবুল করতে চায় তাহলে তাকে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। সে মুসলিম পরিবারে পয়দা হলেও তাকে এসব নিয়ম মানতে হবে; তা না হলে আল্লাহর দরবারে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না।

'ইসলাম' শব্দ থেকেই 'মুসলিম' শব্দ তৈরি হয়েছে। যে ইসলাম কবুল করল সে-ই মুসলিম হলো। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। মুসলিম মানে যে আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

করল বা আত্মসমর্পণকারী। 'মুসলিম' আরবী শব্দ। ফারসি ভাষায় মুসলমান বলা হয়।

সঠিকভাবে ইসলাম কবুল করতে হলে–

১. প্রথমেই মনে মনে ফায়সালা করতে হবে যে, আমি আমার মর্জিমতো চলব না; যা করলে আল্লাহ খুশি হন তা-ই করব।

২. এরপর বুঝে-শুনে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে হবে– "আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুলুহূ।" এর তরজমা হলো– "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" ইলাহ ও মা'বুদ মানে হুকুমকর্তা, প্রভু বা মনিব।

"লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কথাটি কালেমায়ে তাইয়েবা নামে পরিচিত। কালেমা মানে কথা। তাইয়েবা মানে পবিত্র। কালেমা তাইয়েবা মানে পবিত্র কথা।

৩. এ কালেমার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। না বুঝে শুধু কালেমা উচ্চারণ করলেই চলবে না। কারণ, কোনো শব্দের অর্থটাই আসল; শব্দটা আসল নয়। যেমন– 'আগুন' একটা শব্দ। এ শব্দের মধ্যে আগুন নেই। আগুন একটা জিনিস। 'আগুন' শব্দ বলে আমরা ঐ জিনিসকেই বুঝি। কালেমা তাইয়েবার মধ্যে যে ক'টি শব্দ আছে, এগুলোর অর্থই আসল। তাই ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় যে অর্থ বুঝতে হবে তা-ই হলো আসল কালেমা।

৪. কালেমা তাইয়েবার অর্থ

ক. 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, "আমি শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না।"

খ. 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, "মুহাম্মদ (স) যে নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি ঠিক সে নিয়মেই পালন করব; অন্য কারো নিকট থেকে কোনো নিয়ম কবুল করব না।

আসল কথা হলো, কালেমা তাইয়েবা এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, না বুঝে শুধু উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে। এ কালেমা হলো জীবনে চলার ২ দফা নীতি বা পলিসি। ঐ দুটো কথা উচ্চারণ করে ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়, যা আসলে সরাসরি আল্লাহর সাথে ২ দফা ওয়াদা। যে এ ক'টি নিয়ম পালন করে সে-ই ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মুসলিমের করণীয় কী?

মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু করতে হয় সেসবই মুসলিম হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। কারণ, কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে জীবনে চলার যে ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, এর দাবি এটাই। এ নিয়মে চলার জন্যই আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে।

এক দিনের ২৪ ঘণ্টায় আমরা যা করি তা শুরু হয় সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়। রাসূল (স) কী নিয়মে ঘুম থেকে উঠেছেন এবং ওঠার পরে কী নিয়মে পেশাব-পায়খানা করেছেন, তা জেনে সে নিয়মেই এসব করতে হবে। তিনি যে নিয়মে ওযূ করেছেন এবং নামায আদায় করেছেন সে নিয়মেই আমাদেরকে করতে হবে।

এভাবে সারাদিন যা কিছু করতে হয়, সবই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, আয়-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য করা ইত্যাদি সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা বা নিয়মমতো করতে হবে। রাতে ঘুমানোর সময়ও রাসূলের শেখানো নিয়মে ঘুমাতে হবে।

মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কী?

যেহেতু কালেমা তাইয়েবায় জীবনে চলার ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা জানার চেষ্টা করা। মুসলিম হিসেবে যা-ই করা হবে, সবই ২ দফা নীতি মেনেই করতে হবে। তাই যে কাজই করা হোক, তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের শেখানো তরীকা বা নিয়মে করতে হলে তা জানতেই হবে। প্রতিটি কাজের বেলায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা না জানলে কাফিরের মতোই চলতে হবে। এ কারণেই মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব জানা বা ইলম তালাশ করা। ইলম মানেই জ্ঞান। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ওহীর মারফতে রাসূল (স)-এর কাছে যে জ্ঞান পাঠিয়েছেন, সে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন।

ওহীর জ্ঞান বিশাল। ৩০ পারা কুরআন ও লাখ লাখ হাদীস সবই ওহীর জ্ঞান। ওহীর সব জ্ঞান হাসিল করা ফরয নয়। নবী ছাড়া অন্য কেউ ওহীর সব জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না। তাহলে ওহীর কতটুকু জ্ঞান হাসিল করা ফরয?

www.pathagar.com

যার উপর যে কাজের দায়িত্ব আসে ঐ কাজ যেহেতু আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী করতে হবে, সেহেতু ঐ বিষয়ে যতটুকু ইলম দরকার তা জানা ফরয। যে ব্যবসায় করে না তার ব্যবসায় বিষয়ক ওহীর জ্ঞান হাসিল করা ফরয নয়। যে বিয়ে করেনি তার উপর স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে কীভাবে চলতে হবে, সে জ্ঞান হাসিল করা ফরয নয়। বিয়ে করার সাথে সাথে তা ফরয হয়ে যাবে। যার উপর হজ্জ ফরয নয় তার উপর হজ্জের জ্ঞান অর্জনও ফরয নয়। আবার যার সন্তান আছে তার পিতা বা মাতা হিসেবে কী করণীয়, সে বিষয়ে ওহীর জ্ঞান তালাশ করা ফরয।

বিশেষ জরুরি কথা

মুসলিম পরিবারে পয়দা হলে বাপ-মা যদি নামাযী হয় তাহলে ছোট বয়স থেকেই ছেলে-মেয়ে কুরআন পড়া শেখে, নামাযে অভ্যস্ত হয় এবং নিজেকে মুসলমান বলে বুঝতে শুরু করে; কিন্তু বয়স যখন ১৪/১৫ বছর হয় তখন তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা হয়। তখন দেখা যায় যে, ছোট সময়ে পাক্কা নামাযী হওয়া সত্ত্বেও তারা নামাযে অবহেলা শুরু করে এবং একসময় নামায ছেড়েই দেয়।

এ কারণেই বোঝার বয়স হলে সচেতনভাবে নিজের ইচ্ছায় কালেমা তাইয়েবাকে বুঝে ঐ ২ দফা নীতি অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। ঐ ২ দফা পলিসি ঘোষণার মাধ্যমে যে ওয়াদা করা হয়েছে, সে অনুযায়ী চলার জন্য মযবুত ফায়সালা না করলে সে কিছুতেই ঐ পলিসি মেনে চলতে পারবে না।

যারা বুঝে-শুনে এ ফায়সালা করে না তারা ছোট বয়সে নামাযী হওয়া সত্ত্বেও বুঝের বয়সে বেনামাযী হয়ে সারা জীবনই এভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। অল্প বয়সে নামাযী হলে যুবক বয়সে বেনামাযী হয়ে গেলেও বয়স বাড়লে অনেককে আবার নামাযী হতে দেখা যায়।

কিন্তু যে পরিবারে বাবা-মা-ই নামাযী নয় সে পরিবারে যাদের জন্ম, তারা তো ছোট সময়ে কুরআন পড়া ও নামায আদায় করা শেখেই না; বড় হলে তো তাদের মধ্যে মুসলিম চেতনাই দেখা যায় না।

নামায ও রোযা কালেমার ওয়াদামতো চলার যোগ্য বানায়

কালেমা তাইয়েবায় আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী চলার যে ওয়াদা করা হয় সে ওয়াদা পালন করা সহজ নয়। নাফ্‌সের তাড়না, শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুপরামর্শ) ও মন্দ পরিবেশের চাপে পড়ে মানুষ বিবেকের বিরুদ্ধে চলে। নাফ্‌সকে বিবেকের অধীনে আনা খুবই কঠিন। এ কঠিন কাজটি সহজ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা নামায ও রোযার ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

নামাযের মাধ্যমে কালেমার ওয়াদা পালনের অভ্যাস হয়

নামায এমন এক আমল, যেখানে নামাযীর মন-মগজ, মুখ, হাত-পা, চোখ-কান সবই ব্যবহার করতে হয়। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময় সর্বাবস্থায় যা কিছু করা বা বলা হয়, তা সবই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকামতো করতে হয়। কোনো একটা কাজও নামাযীর নিজের ইচ্ছা বা খাহেশমতো করা চলে না। এভাবে প্রতিদিন পাঁচ বার নামাযে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো মন-মগজ ও শরীরের সব অঙ্গকে কাজে লাগিয়ে কালেমার ২ দফা ওয়াদা পালনের অভ্যাস করানো হয়।

এর উদ্দেশ্য কী?

আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকামতো চলার অভ্যাসটাকে নামাযের বাইরেও কায়েম রাখা। নামাযে যেমন মুখে যা ইচ্ছা তা-ই বলা চলে না— আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো বলতে হয়, তেমনি নামাযের বাইরেও মুখে এমন কথা বলা যাবে না, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। নামাযে যেমন দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় হাত নিজের খুশিমতো যেখানে-সেখানে রাখা যায় না, নামাযের বাইরেও হাতকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকাবিরোধী কাজে ব্যবহার করা যাবে না। নামাযে যেমন চোখ দিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে হয়– উপর দিকে বা ডানে-বাঁয়ে দেখা চলে না, তেমনি নামাযের বাইরে সারাদিন চোখকে এমন কিছু দেখা থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে, যা দেখা নিষেধ।

যদি কেউ নামাযের এ চমৎকার উদ্দেশ্য বুঝে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা পালনের অভ্যাস গড়ে তোলে এবং সারাদিনের কাজ-কর্ম ও চলা-ফেরার সময় ঐ অভ্যাসকে তার মন-মগজ, মুখ, চোখ-কান ও হাত-পায়ে চালু রাখে তাহলে সে নামাযের মতোই নামাযের বাইরেও কালেমার ২ দফা ওয়াদা পালন করতে পারবে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নামায ফাহেশা (লজ্জাকর) কাজ ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এ কথাটি তাদের জীবনেই সত্য হয়, যারা নামাযে কালেমার ওয়াদা পালনের অভ্যাস করে এবং সে অভ্যাসকে নামাযের বাইরেও কায়েম রাখে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা কিন্তু নামায পড়তে হুকুম করেননি; নামায কায়েম করার হুকুম করেছেন। আমরা নামায পড়ি; কায়েম করি না। নামাযে যে অভ্যাস করানো হয়, সে অভ্যাস যদি নামাযের বাইরের জীবনেও চালু রাখা যায় তাহলে আমাদের জীবনে নামায কায়েম হবে। এভাবে নামাযকে বুঝলে এবং জীবনে মেনে চললে আমাদের নামায আল্লাহর ঐ ঘোষণা অনুযায়ী আমাদেরকে লজ্জাকর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে।

নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না

আল্লাহ তাআলা সূরা তোয়াহা'র ১৪ নং আয়াতে বলেন,

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ -

অর্থাৎ "আমাকে মনে রাখার জন্য নামায কায়েম কর।"

মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করাই নামাযের সঠিক নিয়ম। জামাআতে হাজির হওয়ার চেষ্টা না করে সবসময় ফরয নামায একা একা পড়ার অভ্যাস করলে এ নামায আল্লাহর দরবারে কবুল নাও হতে পারে। কোনো কারণে জামাআতে ফরয নামায আদায় করতে না পারলে তো ঐ নামায বাধ্য হয়ে একাকীই পড়তে হবে; কিন্তু জামাআতে নামায আদায় করার জন্য রাসূল (স) কঠোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, অন্য একজনকে নামাযে ইমামতি কর[illegible]য়ে আমি (মহল্লায়) ঘুরে দেখি– কারা জামাআতে আসল না; এরপর ঐ সব লোকের ঘর পুড়িয়ে দিই, যারা জামাআতে হাজির হলো না।"

রাসূল (স) আরও বলেছেন, মসজিদে নামায আদায় করলে কমপক্ষে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। আর ফরয নামায ছাড়া বাকি নামায বাড়িতে পড়লে বেশি সওয়াব। তিনি আরও বলেন, "হাশরের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, তখন সাত রকম মানুষ ঐ ছায়ায় আশ্রয় পাবে। তাদের একজন ঐ লোক, যার দিল মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে।"

এর অর্থ হলো, সে মসজিদে নামায আদায় করার পর বাইরে যখন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে তখনও তার মনটা মসজিদমুখী থাকে এবং কখন আযান হয় সেদিকে খেয়াল রাখে ও সময়মতো জামাআতে হাজির হয়।

নামায তাকে সব সময় মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি সব সময়ই আল্লাহর গোলাম। তুমি আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা করতে পার না। এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে মসজিদে জামাআতে আদায় করার অভ্যাস করে নেয়, সে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

খাঁটি নামাযীর ২৪ ঘণ্টার রুটিন

খাঁটি নামাযীর দিনের ২৪ ঘণ্টার কাজ শুরু হয় নামায দিয়ে, শেষও হয় নামায দিয়ে। ঘুম থেকে ওঠার পরে নামাযের আগে আর কোনো কাজ নেই। পেশাব-পায়খানা ও ওযূ-গোসল তো নামাযের জন্য তৈয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যেই করতে হয়। ইশার নামায পড়ে আবার ঘুমিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে দিনের কাজ শেষ হয়। রাসূল (স) বলেন, "যে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর ঘুমিয়ে গেল আবার ফজরের জামাআতে শামিল হলো, তার আমলনামায় ঘুমকেও ইবাদাত হিসেবে লেখা হবে।"

চার ওয়াক্ত নামায সময়ের শুরুতে আদায় করলে বেশি সওয়াব হয়; কিন্তু ইশার নামায রাতের তিন ভাগের এক ভাগ পার হওয়ার পর পড়লে বেশি সওয়াব। এর উদ্দেশ্য একটাই, যাতে ইশার নামাযের পর তাড়াতাড়ি ঘুমানো যায়। যাতে নামাযে মনটা যে অবস্থায় থাকে, ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়া যায়।

এ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, খাঁটি নামাযীর ২৪ ঘণ্টার রুটিন নামাযের অধীন থাকবে; নামায অন্য কাজের অধীন থাকবে না। যেমন– কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাযের সময় মসজিদে না গিয়ে যদি পরে একা নামায পড়া হয় তাহলে নামাযকে কাজের অধীন করা হলো। নামাযের সময় হয়ে গেলে কাজকে মুলতবি করে নামাযে যেতে হবে। তবেই রুটিন নামাযের অধীন হবে।

রোযা নাফ্সকে দমন করার হাতিয়ার

আল্লাহ তাআলা সব মানুষকেই কোন্টা ভালো আর কোন্টা মন্দ, তা বোঝার যোগ্যতা দিয়েছেন। এরপরও মানুষ কেমন করে মন্দ কাজ করে? ইতঃপূর্বে 'নাফ্স ও রূহের লড়াই' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। রূহ যদি দুর্বল থাকে তাহলে নাফ্সের তাড়নায় মানুষ মন্দ কাজ করে। দেহের দাবিকে নাফ্স বলা হয়। দেহের নৈতিক চেতনা নেই বলেই দেহ মন্দ কাজের দিকে টানে। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো– রূহকে এমন শক্তিশালী করা, যাতে সে নাফ্সকে দমন করতে পারে। নামাযও নাফ্সকে দমন করতে সাহায্য করে। যেমন– শীতের মৌসুমে শরীরটা ফজরের সময় লেপ ছেড়ে উঠতে চায় না। কিন্তু নামাযের অভ্যাস হলে রূহের এতটা শক্তি হয় যে, শরীর বা দেহকে লেপ ছেড়ে উঠতে বাধ্য করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা নাফ্সকে দমন করে এর উপর রূহকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রোযাকে সবচেয়ে মযবুত হাতিয়ার হিসেবে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

দেহের দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কড়া দাবি হলো পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা। পেটে বেশি ক্ষুধা লাগলে মানুষ অস্থির হয়ে যা পায় তা-ই খায়। কঠিন পিপাসা লাগলে পানির জন্য পাগল হয়ে যায়। যৌনক্ষুধা যখন তীব্র হয় তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ধর্ষণের যত খবর পত্রিকায় দেখা যায়, তা ঐ যৌনক্ষুধারই ফল।

রমযান মাসের রোযা ঐ রোগেরই আসল ওষুধ। রমযানে দিন শুরু হওয়ার আগে থেকে সূর্য ডোবার সময় পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধার মতো তীব্র দুটো ক্ষুধাকে দমন করতে পারলে নাফ্‌সের অন্য সব দাবিকে দমন করা সহজ হওয়ারই কথা।

গরমের মৌসুমে রাতের চেয়ে দিন অনেক বড় থাকে। দুপুরের পরে খুব খিদা লাগে। কোনো কোনো সময় খুব পিপাসা লাগে। কিন্তু যে রোযা রাখে সে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করে নাফ্‌সকে দমন করে। এভাবে তার রূহের শক্তি বেড়ে যায়।

রোযা ছাড়া এত লম্বা সময় একটানা কিছুই না খেয়ে কেউ থাকে না। তাই শেষবেলায় ভয়ানক খিদা লাগে। ক্ষুধার জ্বালা কেমন, তা ধনীরা রোযার মাধ্যমে টের পায়। আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা পালনের ওয়াদা করে যারা মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা কখনও রোযা অবস্থায় গোপনে কিছু খেয়ে ফেলে না। আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ যে দেখছেন, সে চেতনার কারণেই এভাবে ভুখ-পিপাসায় কষ্ট পেলেও তা তারা সহ্য করে।

রমযানের গোটা মাসটাই একটানা কঠিন ট্রেনিং চলে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে যারা রোযা রাখে তাদের নৈতিক বল বেড়ে যায়। নাফ্‌সকে দমন করার এ ট্রেনিং মানুষকে নাফ্‌সের গোলাম হওয়া থেকে বাঁচায় এবং আল্লাহর গোলাম হওয়ার যোগ্য বানায়।

একটা কথা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার, আল্লাহ রোযাদারকে অনেক বেশি সময় ভুখা রেখে কষ্ট দিতে চান না। তাই শেষরাতে দেরি করে খেলে সওয়াব বেশি। ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত খাওয়া যায়। ওদিকে সূর্য ডোবার সাথে সাথে দেরি না করে ইফতার করলে সওয়াব বেশি। ক্ষুধায় বেশি সময় কষ্ট দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

রোযার হুকুম দিয়ে আল্লাহ রোযাদারকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তুমি নাফ্‌সের গোলাম না হয়ে আমার গোলাম হও। আমি যখন খেতে বলি তখন খাও; যখন খাওয়া বন্ধ করতে বলি তখন বন্ধ করো। তোমার দেহ যখন খেতে চায় তখনই খেতে দেবে না। দেহ দিনের বেলায়ও খেতে চাইতে পারে।

www.pathagar.com

ক্ষুধা মানে খাওয়ার ইচ্ছা। রোযার সময় দুপুরের পর দেহ খেতে চায়; কিন্তু রোযাদার তখন খেতে দেয় না। ভাবখানা এমন যে, আমি আল্লাহর গোলাম; তোর গোলাম নই। আমার মনিবের হুকুমমতো বেলা ডোবার পর খেতে দেব, এর আগে নয়।

এভাবে রোযার মাধ্যমে দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহর হুকুম পালন করার অভ্যাস হয়। রোযাদার নাফ্সকে রূহের অধীনে আনার যোগ্য হয়। নামায ও রোযা এমন চমৎকার ট্রেনিং, যা মানুষকে কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী চলার যোগ্য বানায়।

যাকাত ও হজ্জ

আল্লাহ যেসব খারাপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে টাকা-পয়সা লাগে না; কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে অনেক খরচ করা লাগে। মদ, জুয়া, যিনা, নাচ-গান ও অন্যান্য ফাহেশা কাজের দিকে নাফ্সের সাংঘাতিক ঝোঁক। এসবই আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তাদেরই এসব মন্দ কাজ করার সুযোগ হয়।

তাই ধনী লোকদেরকে কালেমার ওয়াদামতো চলার যোগ্য বানানোর জন্য নামায ও রোযা যথেষ্ট নয়। তাদেরকে নাফ্সের গোলামি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। যাকাতের আসল উদ্দেশ্য হলো সমাজের গরীব লোকদের অভাব দূর করা। যাকাত ধনীকে শেখায় যে–

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে। কারণ, যাকাত হালাল মাল থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমমতো যাকাত আদায়ের পর ধনীর হাতে যে মাল থাকে তা যেমন-খুশি তেমন খরচ করা চলবে না; এর আসল মালিকের মর্জিমতো খরচ করতে হবে।

হজ্জের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর মহব্বতে দুনিয়ার সবকিছু কুরবানী দেওয়ার জযবা পয়দা করা। হজ্জের সময় সেলাইছাড়া দু'টুকরা কাপড় পরে অতি দীনহীনভাবে আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হতে হয়। হজ্জ ধনীকে শেখায় যে–

১. ধন বেশি আছে বলেই বিলাসিতা করে 'ননীর পুতুল' হয়ে যেও না। হজ্জ করার কষ্ট সহ্য করার যোগ্য হও।

২. যত বড় লোকই হয়ে থাক, সেলাইবিহীন দু'টুকরা কাপড় পরে মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে এক হয়ে নিজের বড়ত্ব ভুলে যাও।

www.pathagar.com

৩. আরাফাতের ময়দানে মহান মনিবের সামনে মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়াও, ধনের অহঙ্কার বাদ দাও। তুমি রাজা-বাদশাহ, শাসক বা বড় কর্তা যা-ই হয়ে থাক– এ কথা খেয়ালে রাখ যে, মরার পর তোমার গায়ের দু'টুকরা কাপড়ের মতো কাফন পরিয়েই তোমাকে কবরে রাখা হবে। তোমার ধন ও মান কোনোটাই সাথে যাবে না।

এভাবে যাকাত ও হজ্জ ধনীদেরকে যা শেখায় যদি তারা তা খেয়ালে রাখে, তাহলে তাদের ধন থাকা সত্ত্বেও তারা কালেমার ওয়াদা পালন করে চলতে পারবে। ধন আছে বলেই নাফ্সের গোলাম হবে না; আল্লাহর গোলাম হওয়ার যোগ্যই থাকবে।

ইসলামের পাঁচটি ভিত

রাসূল (স) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিতের উপর কায়েম আছে– (১) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ, (৫) রমযানের রোযা।" (বুখারী ও মুসলিম)

কোনো দালান তৈরি করতে হলে পয়লা এর ভিত বা বুনিয়াদ গড়তে হয়। ঐ বুনিয়াদের উপর দেয়াল তোলা হয়। দেয়ালের উপর ছাদ তৈরি করা হয়। ভিত মযবুত না হলে দেয়াল ও ছাদ টেকে না। তাই দালানের জন্য মযবুত ভিতই পয়লা জরুরি।

শুধু ভিতটুকুই দালান নয়, দেয়াল ও ছাদ মিলেই দালান। ঠিক তেমনি ইসলামের ভিত হলো ঐ পাঁচটি– কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এ ভিতগুলো মযবুত হলে ইসলামের দালানও মযবুত হবে। তাই এ পাঁচটি ভিত সম্পর্কে এত লম্বা আলোচনা করলাম।

কিন্তু এই পাঁচটি ইসলামের দালানের ভিত মাত্র। ইসলামের দালান ও ছাদের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে ইসলামের পুরা দালান তৈরি করেছিলেন। পরিবার, সমাজ, আইন, শাসন, বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবই তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ইসলামের দালান পুরোপুরি কায়েম করে সবচেয়ে শান্তির সমাজ ও দেশ হিসেবে মদীনাকে দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রমাণ করেছিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত ইসলামের ভিত সম্পর্কে জানলাম। ইসলামের গোটা দালান সম্বন্ধে আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে।

www.pathagar.com

আদম ও ইবলিসের কাহিনী

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় হযরত আদম (আ)-কে প্রথম মানব ও বিবি হাওয়া (আ)-কে প্রথম মানবী হিসেবে পাঠালেন। ওহীর মাধ্যম ছাড়া মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না বলেই আল্লাহ প্রথম মানুষটিকেই নবীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ওহীর জ্ঞান অনুযায়ীই পরিচালনা করেছেন।

আল্লাহ কিন্তু মানুষকে ওহীর জ্ঞান অনুযায়ী চলতে বাধ্য করেননি। তিনি মানুষকে তাঁর মর্জিমতো চলার ইখতিয়ার যেমন দিয়েছেন, তেমনি তাঁর হুকুম অমান্য করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে চলার উদাহরণ আদমসন্তানদের মধ্যে শুরু থেকেই দেখা গেছে। আদম (আ)-এর ছেলে কাবিল তার ভাই হাবিলকে কতল করে আল্লাহর বিধান অগ্রাহ্য করেছিল।

আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করার জন্য শয়তানই মানুষকে উসকিয়ে দেয়। শয়তান যে বড় চালাক দুশমন সে কথা বোঝার জন্যই আদমকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে বেহেশতে পাঠানো হয়েছিল। শয়তান বন্ধু সেজে ধীরে ধীরে কীভাবে আদমকে আল্লাহর নাফরমানি করাতে পারল, সে কাহিনী কুরআনের সাতটি সূরায় আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম আল্লাহর হুকুম অমান্য করার নিয়তে তা করেনি, শয়তান তাকে এ ভুল ধারণা দিয়েছে যে, আল্লাহর নিষেধকরা গাছের ফল খেলে চিরকাল বেহেশতে থাকতে পারবে; দুনিয়ায় এসে কষ্ট করতে হবে না। এ ধোঁকায় পড়ে আদম আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ফেলেছে।

কে এই শয়তান? সে জিন জাতির একজন। তার আসল নাম আযাযীল। সে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে এত উন্নতি করেছিল যে, আল্লাহ তাকে ফেরেশতার মধ্যে গণ্য করেছিলেন। আদমকে পয়দা করে আল্লাহ যখন সকল ফেরেশতাকে হুকুম দিলেন, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর', তখন সকল ফেরেশতাই সিজদা করল; কিন্তু আযাযীল সিজদা করতে অস্বীকার করল। সে ফেরেশতার মধ্যে গণ্য ছিল বলেই তারও সিজদা করা উচিত ছিল। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমার হুকুম পালন করলে না? সে জবাবে বলল, আমি আদমের চেয়ে বড়। তাকে তুমি মাটি দিয়ে বানিয়েছ আর আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছ; আমি তাকে সিজদা করতে পারি না। আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিলেন, তার উপর লা'নত নাযিল করলেন। এরপর থেকে তার নাম হয়ে গেল শয়তান ও ইবলিস। শয়তান শব্দের অর্থ অবাধ্য, দুষ্ট আর ইবলিস শব্দের অর্থ হতাশ।

www.pathagar.com

শয়তান আল্লাহকে বলল, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও। তোমার খাস বান্দাহদেরকে অবশ্য আমি ধোঁকা দিতে পারব না; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষকেই আমি তোমার নাফরমান বানিয়ে ছাড়ব। আল্লাহ তাকে সময় দিয়ে বললেন, আমি তোকে ও তোর ধোঁকায় যারা পড়বে, সবাইকে দোযখে দেব।

আল্লাহ কুরআনে মানুষকে সাবধান করে দিলেন যে, শয়তানকে সবসময় দুশমন মনে করবে। সে বন্ধু সেজে যে পরামর্শই দিক তা কখনও মেনে নিও না। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যত খেয়াল, চিন্তা ও ধারণা পয়দা হয় সেসবই শয়তানের কুপরামর্শ মনে করবে।

কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরা 'আন নাস'-এ বলা হয়েছে, আল্লাহর দেওয়া বিধানের বিরোধী কুপরামর্শ দেওয়ার জন্য শয়তানের চেলা বহু জিন ও মানুষ আছে। মানুষের মনগড়া যত মতবাদ ও যত খেয়াল আল্লাহর বিধানের বিরোধী, তা সবই শয়তানের তৈরি এবং শয়তানের চেলারাই তা অন্য মানুষের কাছে পৌঁছায়। ইসলামবিরোধী চিন্তাবিদরা সবাই শয়তানের খলীফা।

এ কাহিনী থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ায় খলীফার মর্যাদা আদমকে না দিয়ে ইবলিসকে দেওয়া উচিত ছিল বলে সে মনে করত। তাই আদমের বিরুদ্ধে সে হিংসায় জ্বলতে লাগল। মানুষ এ মর্যাদার যোগ্য নয় বলে প্রমাণ করার জন্যই সে তার জিন ও মানুষ চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে রাত-দিন মানুষকে ফুসলাচ্ছে ও উসকাচ্ছে। কিন্তু আদম ও ইবলিসের আচরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, খলীফার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য আদম; ইবলিস নয়। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার সাথে সাথেই আদম লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কাতরভাবে তওবা করলেন ও মাফ চাইলেন। আর ইবলিস আল্লাহর হুকুম অমান্য করার নিয়তেই নাফরমানি করল। সে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাবি করল যে, আদমকে সিজদা করার হুকুম দিয়ে আল্লাহই অন্যায় করেছে। অনুতপ্ত না হয়ে সে দাপট দেখিয়ে বিদ্রোহ করেছে। তাই সে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শয়তানের রাজত্ব বনাম আল্লাহর খিলাফত

আল্লাহ তাআলা তখনই নবী পাঠিয়েছেন, যখন মানবসমাজে শয়তানের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। আল্লাহ নবীর কথা মানার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। মানুষকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, ইচ্ছা না হলে সে নবীর কথা মানবে না। তাই ইবলিস মানুষকে ভুল পথে চলার কুপরামর্শ দিয়ে আল্লাহর নাফরমান বানানোর মহাসুযোগ পেয়েছে। এভাবেই দুনিয়ায় শয়তানের রাজত্ব কায়েম হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা নবীকে শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ কোনো অযোগ্য লোককে নবী বানাননি; কিন্তু তিনি যত যোগ্যই হোন ঐ কাজটি তাঁর একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। জনগণ নবীর ডাকে সাড়া না দিলে তাদেরকে বাধ্য করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি। তাই যে নবীর যুগে জনগণ সাড়া দিয়েছে, সে নবীর যুগেই আল্লাহর খিলাফত কায়েম করা সম্ভব হয়েছে।

হযরত মূসা (আ), দাউদ (আ), ইউসুফ (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর যুগে জনগণের প্রয়োজনপরিমাণ সাড়া পাওয়ার ফলেই তাদের হাতে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে বা আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়েছে। হযরত নূহ (আ), ইব্‌রাহীম (আ), শোয়াইব (আ) এবং আরও অনেক নবীর যুগে জনগণের সমর্থন না পাওয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েম হতে পারেনি; শয়তানের রাজত্বই বহাল ছিল। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিদ্রোহী কাওমকে বিভিন্ন রকম আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহর খিলাফত কায়েমের মানে কী?

আগেই আলোচনা করেছি যে, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান ওহীর মাধ্যমে নবীর কাছে পাঠিয়েছেন তা তিনি নিজে চালু করেন না। তাঁর পক্ষ থেকে তা জারি করার জন্য নবীগণ ও ঈমানদারদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এ দায়িত্বটিই হলো খিলাফতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলেই আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধির মর্যাদা হাসিল হয়।

আল্লাহ মানুষকে যে দেহ দান করেছেন তাতে অনেক শক্তি দিয়েছেন– বলার শক্তি, শোনার শক্তি, দেখার শক্তি ইত্যাদি। আরও দিয়েছেন চিন্তাশক্তি, বোঝার শক্তি, ভালো ও মন্দকে চেনার শক্তি ইত্যাদি। আরও দিয়েছেন— ভালোবাসার, ঘৃণা করার, উপকার করার, ক্ষতি করার ইচ্ছা ও শক্তি ইত্যাদি। মানুষের মগজে যে কত শত রকম চিন্তা ভাসে এবং তার মনে যে কত রকম ভাব জাগে এ সবের কোনো শেষ নেই।

এসব শক্তি যদি আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় তাহলে দেহের উপর আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়। আর যদি মনগড়া খেয়াল অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় তাহলে শয়তানের রাজত্বই কায়েম হয়।

তেমনিভাবে পারিবারিক জীবনে যদি আল্লাহর বিধান চালু করা হয় তাহলে পরিবারের উপর আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ময়দানে কি শয়তানেরই রাজত্ব কায়েম থাকবে,

www.pathagar.com

না আল্লাহর খিলাফত কায়েম করতে হবে- এর ফায়সালা করার দায়িত্ব মানুষেরই।

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য নবীর মাধ্যমে যে বিধান পাঠিয়েছেন তা যদি তিনি নিজেই কায়েম করতে চাইতেন তাহলে নবী পাঠাতেন না। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছপালা, পশু-পাখি ও অন্য সকল সৃষ্টির জন্য তিনি যেসব বিধান তৈরি করেছেন, তা তিনি নিজে জারি করেন বলেই এসব বিধান নবীর কাছে পাঠাননি। তাই মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে যে বিধান পাঠিয়েছেন তা আল্লাহ নিজে চালু করেন না, তাঁর পক্ষে যারা তা চালু করার চেষ্টা করেন তারাই খালীফাতুল্লাহর দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর খিলাফত

আমি যদি চাই— আমার দেহের উপর শয়তানের রাজত্ব কায়েম হতে দেব না তাহলে আমি মিথ্যা কথা বলব না, যা দেখা আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা দেখব না, যা শুনতে তিনি নিষেধ করেছেন তা শুনব না, যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা করব না, মগজে কোনো কুচিন্তা আসতে দেব না, মনে কোনো কুভাব জাগতে দেব না, যেসবকে ভালোবাসতে তিনি আদেশ করেছেন সেসবকেই আমি ভালোবাসব, যেসবকে তিনি ঘৃণা করতে বলেছেন, সেসবকে ঘৃণাই করব এবং হাত ও মুখ দিয়ে কোনো মানুষকে কষ্ট দেব না, যতটুকু পারি উপকার করব। এভাবে যদি আমার দেহকে আল্লাহর পছন্দমতো ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমার দেহের উপর আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়েছে বলে প্রমাণ হবে। আর যদি এ চেষ্টা না করি তাহলে আমার দেহের উপর শয়তানের রাজত্বই কায়েম হবে।

মানবদেহের ইসলাম

মানুষের জন্য তৈরিকৃত দেহের মধ্যে যেসব নিয়ম-কানুন আল্লাহ তাআলা নিজেই জারি করেছেন তা-ই দেহের ইসলাম। এ নিয়ম যখন ঠিকমতো চালু থাকে তখন দেহে কোনো অশান্তি থাকে না। শরীরে রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস আসা-যাওয়ার নিয়ম, খাবার হজম হওয়ার নিয়ম, পেশাব-পায়খানার নিয়ম, ঘুমের নিয়ম আল্লাহই বানিয়েছেন; এসব নিয়ম নবীর মাধ্যমে আসেনি। তাই আল্লাহ তাআলা নিজেই তা চালু করেন। এসব নিয়মই হলো দেহের ইসলাম। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই তিনি কতক নিয়ম দিয়েছেন। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত নিয়ম বা বিধানই হলো ইসলাম।

www.pathagar.com

দেহের জন্য আল্লাহর দেওয়া নিয়ম সঠিকভাবে চলতে থাকলে দেহে পূর্ণ সুখ-শান্তি বোধ হয়। কেউ যদি কোনো নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে অসুখ হয়, দেহে অশান্তি বোধ হয়। অসুখ মানেই সুখের অভাব। অসুখ হলে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে যে, শরীরের জন্য আল্লাহর দেওয়া নিয়মে কী কী অনিয়ম হয়েছে। চিকিৎসা মানে আল্লাহর দেওয়া নিয়মটাকে আবার বহাল করা। ডাক্তারি বিদ্যা হলো শরীরের জন্য আল্লাহর দেওয়া নিয়মগুলোকে জানা এবং কোনো কারণে অনিয়ম হয়ে গেলে সে নিয়ম বহাল করার বিদ্যার্জন। এ থেকে এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, দেহে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম ঠিকমতো চালু থাকলেই সুখ-শান্তি ভোগ করা যায়। আল্লাহর দেওয়া নিয়মে গোলমাল হলেই অসুখ ও অশান্তি হয়।

প্রকৃতির জগতে কোনো অশান্তি নেই কেন?

প্রকৃতির জগৎ বলতে বোঝায় মহাশূন্যের কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, জঙ্গল-গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি। এসব সৃষ্টির প্রত্যেকটির জন্যই আল্লাহ তাআলা আলাদা আলাদা বিধান তৈরি করেছেন। সেসব বিধান আল্লাহ নিজেই জারি করেন। এ কারণেই প্রকৃতির জগতে কোনো অশান্তি নেই। নিয়মমতো সবকিছু চললে অশান্তি হতে পারে না।

অশান্তি হয় মানুষের জীবনে। পরিবারের জন্য আল্লাহ যে নিয়ম-কানুন দিয়েছেন, তা না মানার কারণেই অশান্তি হয়। তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং লেনদেনের কর্তব্য পালনে অবহেলার কারণে মানবসমাজে অশান্তি লেগেই আছে। এসব বিষয়ে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ যে নিয়ম-কানুন পাঠিয়েছেন তা পালন না করার কুফলই হলো বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি।

একজনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক, এক পরিবারের সাথে আরেক পরিবারের সম্পর্ক, এক দলের সাথে আরেক দলের সম্পর্ক, এক গ্রামের সাথে অপর গ্রামের সম্পর্ক, এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্ক কেমন থাকা উচিত, সে বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মেনে চললে অশান্তি হতেই পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা-মাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, ডাক্তার-রোগীর সম্পর্ক, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক, সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক– এসব বিষয়ে আল্লাহর বিধান মেনে না চললে অশান্তি হবে না কেন?

www.pathagar.com

এতসব বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধান না জানলেও বিবেক-বুদ্ধিতে সবাই যা করা উচিত বলে জানে তা কয়জন পালন করে চলে? তাহলে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

যত রকম সম্পর্কের কথা উপরে লিখলাম এর প্রতিটিতেই দুটো পক্ষ আছে। যেমন– স্বামী ও স্ত্রী। স্বামীর যেমন অধিকার আছে, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার আছে। স্বামীর যেমন কর্তব্য আছে, স্ত্রীরও তেমনি কর্তব্য আছে। এ অধিকার ও কর্তব্য নিয়েই সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্বামীর যা অধিকার তা-ই স্ত্রীর কর্তব্য। আর স্ত্রীর যা অধিকার তা-ই স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী যদি তার কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে তাহলে স্বামী তার অধিকার পেয়ে যাবে। তেমনি স্বামী যদি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করে তাহলে স্ত্রী তার অধিকার পেয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ তাআলা যার যার কর্তব্য পালন করার তাগিদ দিয়েছেন, যাতে উভয়েই তাদের অধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায়, স্বামী তার অধিকার পাওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর চাপ দিচ্ছে, কর্তব্য পালনের ধার ধারছে না কিংবা স্ত্রী তার অধিকার আদায় করার দাবি জানাচ্ছে, নিজের কর্তব্য পালন করছে না। ফলে দু'জনই অশান্তি ভোগ করছে। শুধু যার যার অধিকার আদায় করার ধান্দায় থাকলে কি কর্তব্য আপনা-আপনিই পালিত হয়ে যাবে? অথচ দু'জনই যার যার কর্তব্য পালনে মনোযোগ দিলে যার যার অধিকার আপনা-আপনিই পেয়ে যাবে।

সব সম্পর্কের বেলায়ই এ নিয়মটি সত্য। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতাকে তাগিদ দেননি যে, তোমরা সন্তানদের কাছ থেকে তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাক। তিনি সন্তানদেরকে বলেননি যে, তোমরা তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। তিনি দু'পক্ষকেই তাদের কর্তব্য পালনের তাগিদ দিয়েছেন, যাতে সবাই যার যার অধিকার সহজেই পেয়ে যায়।

সব মানুষই শান্তি চায়। সুখ-শান্তি দেওয়ার যিনি মালিক, তিনি যা করতে বলেছেন তার উল্টা কাজ যে করে, সে কি আসলে শান্তি চায়? সবাই যা কিছু করে নিজের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের নিয়তেই করে। এমনকি যে আত্মহত্যা করে সেও তার ভালো হবে মনে করেই তা করে। অথচ এটা যে চরম ভুল, তা সে জানে না।

www.pathagar.com

আমরা যখন কোনো যন্ত্রপাতি কিনি তখন দেখা যায়, কীভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে লেখা 'নির্দেশিকা' (ক্যাটালগ) সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়। যে যন্ত্রটি তৈরি করেছে সেই ভালো জানে যে, কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে। যদি কেউ ঐসব নিয়মের ধার না ধারে যেমন-তেমন ব্যবহার করে, তাহলে সুফল পাওয়া তো দূরের কথা; মহাবিপদেও পড়তে পারে। এমনকি যন্ত্রটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে গোটা বিশ্বজগৎ ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন এবং সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার যোগ্য হাতিয়ার হিসেবে দেহ দান করেছেন। সৃষ্টিজগৎ ও দেহকে কেমনভাবে ব্যবহার করতে হবে তা তিনি নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। নবী নিজে ঐ সব নিয়ম পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মানুষ যদি তা মেনে না চলে তাহলে যা হওয়ার তা-ই ঘটছে। দুনিয়ায় এত অশান্তির কারণ এটাই।

আল্লাহ্ দুনিয়াতেও শাস্তি দেন

আল্লাহর বিধান অমান্য করার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষ অশান্তির শাস্তি তো পাচ্ছেই, আখিরাতেও চরম শাস্তি পেতে থাকবে। দুনিয়াতেও আল্লাহ্ বিরাট আকারে শাস্তি দিয়ে থাকেন। ভূমিকম্প, সুনামি, ঝড়-তুফান, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, এমন একটি বিরাট শক্তি রয়েছে, যার মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই।

মাটি, পানি, বাতাস, আগুন মানুষের খিদমতের জন্যই আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন। এসবকে ব্যবহার করেই মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে থাকে। কিন্তু মানুষের নাফরমানি চরমে পৌঁছলে আল্লাহ এসব খিদমতের জিনিসকে দিয়েই শাস্তি দিয়ে থাকেন। এসব জিনিসের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনিই এসবকে মানুষের খিদমতে লাগিয়ে রেখেছেন। আবার তিনিই আযাব দেওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করেন।

আমরা সব তাঁরই রাজ্যে বাস করছি। তিনি যদি আমাদের আচরণে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা সুখ-শান্তি পাব। আর তিনিই যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে উভয় জায়গায়ই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

মযবুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে

আমি দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে চাই কিনা– এ বিষয়টি আমার জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনে যদি আল্লাহর রহমত না পাই তাহলে কোনো উপায় থাকবে না। বিষয়টা মোটেই হালকা নয়। যদি আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি দুনিয়ার অশান্তি থেকে বাঁচতে চাই এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই, তাহলে আমাকে এ কয়টি কাজ করতে হবে :

১. ঈমানকে মযবুত করতে হবে। ২. সহীহ ইলম হাসিল করতে হবে। ৩. নেক আমল করতে হবে।

কেউ যদি নিজেকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তাকে তিন দিক দিয়ে গড়ে উঠতে হবে। তার মন, মগজ ও চরিত্র গড়তে হবে। মনের সাথে ঈমানের সম্পর্ক, মগজের সাথে ইলম বা জ্ঞানের সম্পর্ক আর চরিত্রের সাথে আমলের সম্পর্ক। বাংলায় মন-মগজ-চরিত্র বললে আরবীতে ঈমান-ইলম-আমল বোঝায়।

এ তিনটি দিক দিয়েই মানুষ গড়ে ওঠে। তাহলে সবার আগে ঈমান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।

ঈমান

'ঈমান' আরবী শব্দ। এর বাংলা হলো 'বিশ্বাস'। আমরা বিশ্বাস শব্দটি সবাই বলি। কিন্তু এর সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। আমরা জ্ঞানের চারটি উৎসের আলোচনায় জেনেছি যে, পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই আমরা সরাসরি জ্ঞান লাভ করি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়– চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চামড়া দিয়ে খুব সামান্য জ্ঞানই আমরা পেয়ে থাকি। যখন সরাসরি জ্ঞানে (Direct knowledge) কোনো বিষয় জানতে পারি না, অথচ ঐ বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হচ্ছে তখন বাধ্য হয়ে পরোক্ষ জ্ঞানের (Indirect knowledge) সাহায্য নিতে হয়। পরোক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তারই নাম 'বিশ্বাস'।

একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি– আমার পরিচিত এক লোক এসে বলল, 'ভাই আমাকে ৫০০ টাকা কর্জ দাও, আমি এক সপ্তাহ পর ফেরত দেব।' এক সপ্তাহ পর সে ফেরত দেবে কি না, সে বিষয়ে তো আমার সরাসরি জ্ঞান নেই। আমি টাকা ধার দেব কি দেব না, সে বিষয়ে কেমন করে সিদ্ধান্ত নেব? আমাকে তো একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে– হয় তাকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দেব, আর বিশ্বাস না হলে দেব না। এ সিদ্ধান্ত আমি কেমন করে নেব?

www.pathagar.com

তার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাতে যদি আমার ধারণা হয়, তাকে টাকা দিলে ফেরত পাওয়া যাবে তাহলে ধার দেব। আর যদি মনে হয়, এ লোক ফেরত দেবে না তাহলে ধার দেব না। সত্যি ফেরত দেবে কি না তা সরাসরি জানার উপায় নেই। পরোক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এ উদাহরণ থেকে বুঝতে হবে, 'বিশ্বাস' মানে কী? 'বিশ্বাস' বললে কী বোঝায়? 'বিশ্বাস'এর সংজ্ঞা কী? তা হলো চারটি কথা :

১. যে বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই।

২. অথচ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

৩. তাই পরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় নেই।

৪. পরোক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এরই নাম 'বিশ্বাস'।

লোকটির উপর বিশ্বাস হলে ধার দেব, অবিশ্বাস হলে দেব না। এখানে মজার ব্যাপার হলো, অবিশ্বাসটাও এক রকমের বিশ্বাস। একটি ইতিবাচক বিশ্বাস, অপরটি নেতিবাচক। অবিশ্বাস মানে এ বিশ্বাস যে, সে টাকা ফেরত দেবে না। টাকা দেওয়া ও না দেওয়া দুটোই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

এবার একটা বড় উদাহরণ দিচ্ছি। মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে কিনা, এ বিষয়ে সরাসরি জানার উপায় নেই। অথচ বিষয়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। "আখিরাত থাকলে থাকুক না থাকলে না থাকুক আমার কী"— এভাবে উড়িয়ে দেওয়ার মতো বিষয় এটা নয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে বহু পরোক্ষ জ্ঞান দান করেছেন; যার ফলে মানুষ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আল্লাহর দেওয়া মযবুত যুক্তি বুঝলে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

এ দুটো উদাহরণ থেকে আমরা সহজভাবে বিশ্বাস বা ঈমানের অর্থ বুঝতে পারলাম।

বিশ্বাস ছাড়া কি চলা যায়?

পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এত সামান্য বিষয় জানা যায় যে, বিশ্বাস ছাড়া মানুষ একদিনও চলতে পারবে না। আমার মা কে, বাবা কোন্ জন– এ বিষয়ে আমার কি সরাসরি জ্ঞান আছে? বিশ্বাস ছাড়া উপায় কী? স্ত্রী যে খাবার খেতে দিল তাতে বিষ আছে কি না, তা তদন্ত করে কি খাই? বিশ্বাস না হলে খাওয়াই বন্ধ। অসুখ হলে ডাক্তার ওষুধ দেয়। এ ওষুধে কাজ হবে কি না, তা কি সরাসরি জানি? বিশ্বাস করেই ওষুধ খেতে হয়। চাষী জমিতে ফসল বুনে। এবার ফসল হবে কি

www.pathagar.com

না, তা সে জানে না। গতবার হয়েছে, এর আগের বারও হয়েছে। তাই বিশ্বাস হয় যে, এবারও হবে। এ বিশ্বাস না হলে কি চাষী ফসল বুনতে পারবে? একটু চিন্তা করলেই সবাই বঝুতে পারবে যে, বিশ্বাস ছাড়া মানুষের জীবন অচল।

বিশ্বাস ও কর্ম দু'রকম হয় না

এ কথা খুবই সত্য যে, মানুষ যে রকম বিশ্বাস করে সে রকম কাজই করে। বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক অতি নিকটবর্তী। টাকা ধার দিলে ফেরত পাওয়া যাবে না বিশ্বাস হলে কর্ম সে রকমই নেতিবাচক হবে– যার এ বিশ্বাস সে অবশ্যই ধার দেবে না। তাই মানুষের কর্ম থেকেই তার বিশ্বাস কেমন তা বোঝা যায়। যে নিজেকে মুসলমান মনে করে, অথচ নামাযের ধার ধারে না– বোঝা যাবে যে, তার ঈমান অতি দুর্বল। যে আখিরাতে বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, সে ইচ্ছা করে জেনে-শুনে মন্দ কাজ করতে পারে না। যদি মন্দ কাজ করে তাহলে মনে করতে হবে যে, তার বিশ্বাসে গোলমাল আছে। হয়ত সে মনে করে, মরার আগে তাওবা করলেই মাফ হয়ে যাবে। কর্ম ও বিশ্বাসে বেমিল থাকলে বুঝতে হবে যে, বিশ্বাস সঠিক হয়নি।

মুসলিম হতে হলে যা বিশ্বাস করা জরুরি

কেউ যদি ইসলাম কবুল করতে চায় বা মুসলিম হতে চায়, তাহলে তাকে ৭টি বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, যার পরোক্ষ জ্ঞান কুরআন ও হাদীসে আছে। তাকে ঘোষণা করতে হবে :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

এর অর্থ হলো আমি ৭টি বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি :
১. আল্লাহ, ২. তাঁর ফেরেশতাগণ, ৩. তাঁর কিতাবসমূহ, ৪. তাঁর রাসূলগণ, ৫. আখিরাতের দিন, ৬. তাকদীর-এর ভালো ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, ৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া।

এ ৭টির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. আল্লাহ : যিনি আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই পয়দা করেছেন। আল্লাহই তাঁর আসল নাম। তাঁর বহু গুণবাচক নাম রয়েছে। অন্যান্য ধর্মও বিশ্বাস করে যে, সব কিছুর স্রষ্টা একজনই। খ্রিস্টানরা তাঁকে গড (God) নামে ডাকে। হিন্দুরা বলে ঈশ্বর বা ভগবান।

www.pathagar.com

২. ফেরেশতা : ফেরেশতারা আল্লাহর কর্মচারী; তাঁরা ভালো ও মন্দ সম্পর্কে জানেন। কিন্তু তাঁরা সব সময়ই আল্লাহর হুকুম পালন করেন। তাঁরা কখনও আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলেন না। আল্লাহর কোনো গুণের সাথেই তাঁরা কোনো দিক দিয়ে শরীক নন। তাঁরা শুধুই কর্মচারী।

৩. কিতাব : রাসূলগণের নিকট ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন। শেষ রাসূলের নিকট কুরআন নাযিল করা হয়েছে। পূর্বের কিতাবগুলোর কোনোটাই আসল অবস্থায় নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত আসল অবস্থায় হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আমাদেরকে হুকুম করা হয়েছে, যেন আমরা একমাত্র কুরআনকে মেনে চলি। কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ সকল নবী ও রাসূলের কাছেই ওহী পাঠিয়েছেন।

৪. রাসূলগণ : এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তবে একমাত্র শেষ নবীকেই মেনে চলতে হবে।

৫. আখিরাতের দিন : যেদিন সব মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে, সে দিনকেই আখিরাতের দিন বলা হয়েছে। সেখানে সব মানুষের বিচার হবে এবং ফায়সালা হবে যে, কে বেহেশতে যাবে, আর কে দোযখে যাবে।

৬. তাকদীর : এ শব্দটির অর্থ হলো যা নির্ধারিত হয়ে আছে। এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, দুনিয়ায় তা-ই ঘটে যা আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। ভালো ও মন্দ যা-ই ঘটে আল্লাহর ফায়সালামতোই ঘটে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।

তাকদীর সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া ঈমানের জন্য খুবই জরুরি। দুটো কথা বুঝে নিলেই এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না :

ক. আল্লাহ তাআলা মানুষকে কোনো কাজ সমাধা করার ক্ষমতা দেননি। মানুষ কোনো কাজের জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পারে মাত্র। কাজটি পুরা হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি তাকদীরে থাকে তাহলে সমাধা হবে। তাকদীরে না থাকলে কাজটা সম্পন্ন হবে না।

খ. কোনো কাজের শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করার ক্ষমতাই মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তাই যদি মানুষ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করে তাহলে কাজটা সমাধা না হলেও সে কাজটা পুরা করেছে বলে পুরস্কার পাবে। তেমনিভাবে যদি সে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাহলে কাজটা পুরা না হলেও সে শাস্তি পাবে। কাজটা সমাধা করার ক্ষমতা তো

www.pathagar.com

মানুষকে দেওয়াই হয়নি। যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এর ভিত্তিতেই পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।

যেমন– কেউ যদি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা করে এবং কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়, কিন্তু পথেই মারা যায় তাহলে সে হজ্জ করার পুরস্কার পাবে। কারণ, তার ক্ষমতা যতটুকু আছে ততটুকু সে করেছে।

তেমনি যদি কেউ কাউকে মেরে ফেলার জন্য ইচ্ছা করে এবং শাবল হাতে নিয়ে মাথার উপরে তুলে মারার চেষ্টা করে, কিন্তু দু'জন লোক দৌড়ে এসে ধরে ফেলার কারণে মারতে না পারে তাহলে মেরে ফেলার ইচ্ছা ও চেষ্টা করার দোষে আদালতে সে শাস্তি পাবে।

এর দ্বারা প্রমাণ হয়, পুরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার জন্য কাজটি সমাধা হওয়া জরুরি নয়। ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হলেই পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। তাকদীরের সাথে পুরস্কার ও শাস্তির কোনো সম্পর্ক নেই। তাকদীর আল্লাহর হাতে।

৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া : মানুষের শরীরটাই শুধু মরে। আসল মানুষ 'রূহ' মরে না। কিয়ামতের পর সব মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। দুনিয়ার কাজের হিসাব নেওয়া হবে এবং বিচারের পর বেহেশত কিংবা দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এ সাতটি বিষয়ে সরাসরি কোনো জ্ঞান মানুষের নেই। তাই কুরআন ও হাদীসের পরোক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই এ সবের উপর ঈমান আনতে হয়।*

তাওহীদ-রিসালাত-আখিরাত

ঈমানের ঐ ৭টি বিষয় তিনটি বিষয়ের মধ্যেই শামিল আছে।

১. তাওহীদের মধ্যে আল্লাহ, ফেরেশতা ও তাকদীর শামিল রয়েছে।

২. রিসালাতের মধ্যে আছে কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ।

৩. আখিরাতের মধ্যে মৃত্যুর পরের জীবন ও বিচারের দিন।

'তাওহীদ' মানে একক। এ শব্দটি 'শিরক' শব্দের বিপরীত। আল্লাহর সাথে কোনো দিক দিয়েই আর কোনো সত্তা শরীক নেই। আল্লাহ তার সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারে একক। এর কোনোটাতেই আর কোনো সৃষ্টি শরীক নয়। ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টি আল্লাহর অধীন। শিরক মানে শরীক করা। আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে কোনো দিক দিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করা সবচেয়ে বড় গুনাহ যা তিনি মাফ করবেন না বলে কুরআনে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন।

---

* মাওলানা মওদূদীর লেখা 'ইসলাম পরিচিতি' বইটিতে ঐ সাতটি বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

ফেরেশতাদেরকে কাফিররা আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত। আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদেরকে দেব-দেবী বলে বিশ্বাস করে— এ সবই শির্ক। অন্ধকারের বিপরীত যেমন আলো, তেমনি শির্কের বিপরীত হলো তাওহীদ। অন্ধকার মানে আলো নেই। আলো মানে অন্ধকার নেই। শির্ক থাকলে তাওহীদ নেই। তাওহীদ থাকলে শির্ক নেই।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

যখন কেউ আল্লাহর উপর ঈমান আনে তখন তার পরিচয় হয়ে যায় 'মুমিন'। কুরআনে 'ইয়া আইয়ুহাললাযীনা আমানূ' কথাটি দিয়ে বহু আয়াত শুরু হয়েছে। এর অর্থ হলো, 'হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ!' এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানদার হিসেবে ডাক দিয়ে কথা বলেন।

কুরআনের শেষ সূরাটির নাম 'আন্ নাস'। এ সূরাটিতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক তিন রকমের – রাব্বিন্ নাস, মালিকিন্ নাস ও ইলাহিন্ নাস।

১. তিনি মানুষের রব। ২. তিনি মানুষের বাদশাহ। ৩. তিনি মানুষের ইলাহ।

সত্যিকার ঈমানদার হতে হলে এ তিন রকমের সম্পর্কের মর্ম বুঝতে হবে। আমি যদি ঈমানদার বলে দাবি করি তাহলে এ কথা খেয়াল রাখতে হবে যে–

১. আল্লাহর সাথে আমার পয়লা সম্পর্ক হলো, তিনি আমার রব। রব শব্দের অর্থ হলো যিনি লালন-পালন করেন। তিনি আমাকে মায়ের পেটে ১০ মাস লালন-পালন করেছেন। পয়দা হওয়ার সাথে সাথে মায়ের বুকে আমার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই আমি মরে যাব। তিনি আমার নিঃশ্বাস জারি রেখেছেন বলেই আমি বেঁচে আছি। তিনি যতদিন আমার হৃদ্পিণ্ডকে চালু রাখেন ততদিনই বেঁচে থাকব। এমন রবকে কি ভোলা যায়? মায়ের স্নেহ-মমতা কি ভোলা যায়? যে রব আমার মায়ের মনে এমন মায়া দিলেন তাঁকে তো সব সময়ই মনে রাখা উচিত। তাই তিনি নামাযে রুকু ও সিজদায় 'আমার রব' 'আমার রব' জপ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি 'রাব্বুল আলামীন', তথা সারা জাহানের রব। তবু আমাকে 'আমার রব' বলার অনুমতি দিয়ে আপন করে কাছে টেনে নিলেন। শিশু 'আমার আম্মু' 'আমার আব্বু' না বললে তৃপ্তি পায় না; যদিও আম্মু তার একার নয়, আরও ভাই-বোন তার আছে।

www.pathagar.com

২. দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো, তিনি আমার বাদশাহ। তাঁরই রাজ্যে আমি আছি। তিনি যদি আমার উপর খুশি থাকেন তবেই আমি সুখে থাকতে পারব। তাই সুখ পেতে হলে আমার এমন কিছু করা উচিত নয়, যা তিনি অপছন্দ করেন। এ বিষয়ে সব সময় আমাকে সাবধান থাকতে হবে।

৩. তৃতীয় সম্পর্ক হলো, তিনি আমার ইলাহ। আমাদের দেশে ইলাহ শব্দের যে অর্থ চালু আছে তা হলো 'উপাস্য'। উপাস্য মানে উপাসনা বা পূজার পাত্র, যার উপাসনা বা পূজা করা হয়। যদি এ অর্থ মেনে নেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, শুধু উপাসনা করার সময় তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক, অন্য সময় কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ তিনি যেমন আমার সব সময়ই রব এবং বাদশাহ তেমনি সব সময়ই ইলাহ। তাই ইলাহ শব্দের 'উপাস্য' অর্থ করা একেবারেই ভুল।

ইলাহ শব্দের সমমর্যাদায় আরবীতে আরেক শব্দ হলো মা'বুদ। মা'বুদ মানে মনিব। আবদ মানে দাস, মা'বুদ মানে যার দাসত্ব করা হয়। দাস হলো হুকুমের গোলাম, আর মা'বুদ হলো দাসের হুকুমকর্তা। এ অর্থে ইলাহ মানে হুকুমদাতা বা হুকুমকর্তা। হুকুমকর্তা অনেক আছে, যেমন– পিতা-মাতা, অফিসের বস, সরকার ইত্যাদি। কিন্তু তারা হুকুমকর্তা হলেও প্রভু বা মনিব নয়। আল্লাহ তাআলা হুকুমকর্তা প্রভু। তাই আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুম যদি কোনো হুকুমকর্তা দেয় তাহলে সে হুকুমকর্তাকে মানা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। তাহলে ইলাহ শব্দের অর্থ দাঁড়াল 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'।

আল্লাহ আমার ইলাহ– এ কথার মর্ম অনেক গভীর। তিনি সব সময় আমার একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। অন্য কোনো হুকুমকর্তা আমার প্রভুর হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুম করলে তা আমি কিছুতেই মানব না।

গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভুর সাথে আমার মতো নগণ্য দাসের এ তিন রকম সম্পর্কের সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে যে বিরাট গৌরব ও মর্যাদা দান করেছেন, তা এক মুহূর্তও কি ভুলে থাকা উচিত?

তিনি আমার প্রতিপালক, আমি প্রতিপালিত। তিনি আমার বাদশাহ, আমি তাঁর প্রজা, তিনি আমার একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু আর আমি তার হুকুমের গোলাম। এ চেতনাই ঈমানের প্রাণ। এ চেতনা সজাগ থাকলে ঈমান মযবুত থাকবে।

www.pathagar.com

তাফাজ্জল হোসাইনের লেখা একটা গানের দুটো লাইন এখানে উল্লেখ করছি–

"আল্লাহ আমার রব, এই রবই আমার সব।
দমে দমে তনুমনে তাঁরই অনুভব।"

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ও দেহমনে এ কথা অনুভব করাই হলো চেতনা।

ঈমান কীভাবে দুর্বল হয়?

নাফ্স ও রূহের মধ্যে যে লড়াই চলে সে আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রূহ দুর্বল থাকলে নাফ্স জয়ী হয়। নাফ্সের জয়ই হলো ঈমানের দুর্বলতা। ঈমান দুর্বল হলেই নাফ্সের জয় হয় আর রূহের পরাজয় হয়।

সূরা আলে ইমরানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "মানুষের জন্য তাদের পছন্দসই জিনিসের মধ্যে– নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, বাছাইকৃত ঘোড়া, পালিত পশু ও চাষের জমি খুবই কামনার বিষয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এ সবই দেহ বা নাফ্সের জন্য লোভনীয়। একদিকে নাফ্স মানবদেহকে এদের দিকে টেনে নেয়, অপরদিকে রূহ আল্লাহর দিকে টানে। রূহের এ টান আছে বলেই কতক মানুষ দুনিয়ার সব মজা ছেড়ে দিয়ে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী হয়ে জঙ্গলে চলে যায়। দুনিয়া ত্যাগ করা কি সহজ? তাঁরা মনে করেন যে, দুনিয়ার লোভনীয় জিনিসের মধ্যে থাকলে রূহের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা দুনিয়া থেকে পালিয়ে নাফ্সের তাড়না থেকে বাঁচতে চায়। জঙ্গলে গাছের নিচে পাথরের উপর বসে আল্লাহ বা ঈশ্বরের যিক্র ও ধ্যানে ডুবে থাকে।

কিন্তু এ পথ আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি যাদেরকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁরা মানুষকে বৈরাগী হওয়ার শিক্ষা দেননি। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টিই আল্লাহর তাসবীহ জপে। সন্ন্যাসী যে গাছের নিচে পাথরের উপর বসে তাসবীহ জপছে, ঐ গাছ এবং পাথরও যিক্র করছে; কিন্তু গাছ ও পাথরের মতো নীরবে যিক্র করার জন্য তো মানুষকে পয়দা করা হয়নি। মানুষকে তো খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাই আসল দায়িত্ব বাদ দিয়ে যারা গাছ ও পাথরের মতো হওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আল্লাহ বলবেন, তোকে তো গাছ বা পাথর বানাইনি; মানুষ বানিয়েছি। গাছ-পাথর হতে গেলি কেন? সংসারত্যাগীদেরকে ফারসি ভাষায় 'দরবেশ' বলা হয়। আসলে আল্লাহর কাছে তাদের দর খুবই কম,

www.pathagar.com

বেশি নয়। দুনিয়ার টান থাকা সত্ত্বেও যারা দুনিয়ার গোলাম না হয়ে আল্লাহর গোলাম হতে পারে তাদের কৃতিত্বের জন্যই তারা বেহেশতে যাবে। ফেরেশতাদের গুনাহ করার ক্ষমতাই নেই। তাই সবসময় আল্লাহর হুকুম পালন করা সত্ত্বেও তাঁদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে না। কারণ, এতে তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই।

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে আটটি জিনিসের তালিকা দিয়েছেন। যথা– পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়, কামাই করা সম্পত্তি, আয়-রোজগারের মাধ্যম ও বাড়ি। এ ৮টি জিনিসকে ভালোবাসার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ৮টির ভালোবাসা যদি অন্য তিনটির চেয়ে বেশি হয় তাহলেই ঈমান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে। ঐ ৩টি হলো আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ (ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা)। ঐ ৮টি জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থাকা দূষণীয় নয়, বরং কর্তব্য। এ সবের ভালোবাসা ত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে গেলেও অপরাধ হবে। আবার এ কয়টির প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ পরের তিনটির চেয়ে বেশি হলেই অপরাধ।

একটা সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি : পানি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই বলা হয়, পানির অপর নাম জীবন। প্রশ্ন হলো, পানিই যদি জীবন হয় তাহলে পানিতে ডুবে মানুষ মরে কেন? এতে বোঝা গেল, পানি জীবন নয়। পানির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণই হলো জীবন। ঐ পরিমাণের বেশি হলেই মরণ। পানিই জীবন, আবার পানিই মরণ। এ জীবন-মরণ পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

তেমনিভাবে ঐ ৮টি জিনিসের ভালোবাসা যদি পরিমাণমতো হয় তাহলে ঈমানের জীবন; আর পরিমাণের বেশি হলেই ঈমানের মরণ।

আল্লাহ তাআলা ঐ আয়াতে সহজ কথায় বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো চললে এবং দুনিয়ায় শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করতে গেলেই প্রমাণ হবে যে, ঈমান দুর্বল না সবল। ঐ আটটির কারণে যদি এ তিনটির প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে, ঈমান দুর্বল।

www.pathagar.com

ইলম

আরবী 'ইলম' (عِلْم) শব্দের বাংলা হলো বিদ্যা বা জ্ঞান। কুরআন ও হাদীসে ইলম শব্দ দ্বারা ওহীর ইলম বোঝানো হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন, ইলম তালাশ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এখানে ইলম অর্থ যদি সব বিদ্যাই হয় তাহলে কেউ এ ফরয আদায় করতে পারবে না। ডাক্তারি বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি শেখা সবার উপর ফরয হতে পারে না। তাই এ হাদীসে যে ইলম হাসিলের চেষ্টা করাকে ফরয বলা হয়েছে তা অবশ্যই ওহীর ইলম।

কতটুকু ইলম ফরয?

ওহীর ইলম তো বিশাল। ৩০ পারা কুরআন ও লাখ লাখ হাদীস মিলে ওহীর ইলম। সবটুকু ইলম ফরয হতে পারে না। নবী ছাড়া অন্য কারো ওহীর সবটুকু ইলম জানা নেই। এ বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা সবার জন্য বড়ই জরুরি। কতটুকু ইলম ফরয? এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো, যার উপর যে দায়িত্ব আসে তা পালন করার জন্য যতটুকু ইলম জরুরি ততটুকু হাসিল করাই ফরয।

কালেমা তাইয়েবাতে আমরা দু'দফা ওয়াদা করেছি যে, জীবনে সব সময় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলব। তাই আমাদের যে দায়িত্বই পালন করতে হয়, মুসলিম হিসেবে তা পালন করতে হলে ঐ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কী ও রাসূলের তরীকা কী– তা জেনে নেওয়া ফরয। তা না হলে কাফিরের মতোই দায়িত্ব পালন করা হবে।

যার উপর যাকাত দেওয়া ফরয নয় তার ওপর যাকাতের ইলম হাসিলও ফরয নয়। যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব আসলে সে ইলম ফরয হয়ে যাবে। যে বিয়ে করেনি, মুসলিম স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে কিভাবে চলতে হবে সে ইলম তার উপর ফরয নয়। বিয়ে করার সাথে সাথে দু'জনের উপর তা ফরয হয়ে যাবে।

যে ব্যবসা করে তাকে এ বিষয়ে ওহীর ইলম জানতে হবে। তা না হলে কাফির ব্যবসায়ীর মতোই ব্যবসা করবে– যদিও সে পাক্কা নামাযী ও রোযাদার হয়। যে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করছে, সে যদি মুসলিম শাসকের মর্যাদা পেতে চায় তাহলে রাসূল (স) কিভাবে শাসন করেছেন তা তাকে জানতে হবে। তা না হলে সে কাফির শাসকের মতোই দেশ শাসন করবে। যখন কারো সন্তান পয়দা হয়

www.pathagar.com

তখন মুসলিম পিতা ও মাতার দায়িত্ব পালন করতে হলে এ বিষয়ে ওহীর ইলম হাসিল করতেই হবে।

ওহীর নফল ইলম হাসিলের মূল্য কী?

যে কাজ ফরয সে কাজ যদি ফরযের চেয়ে বেশি করা হয় তাহলে তাকে নফল বলা হয়। নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। ওহীর যে ইলম ফরয নয় ঐ ইলম যদি কেউ শেখে তাহলে শরীআতে এর মূল্য কী? ইসলামী সকল বিধি-বিধানকে এক শব্দে আরবীতে 'শরীআত' বলা হয়।

যার ওপর হজ্জ ফরয নয়, সে যদি হজ্জের ইলম জেনে নেয় তাহলে কি সে কোনো বেহুদা কাজ করল? আমার ওপর দেশ শাসনের দায়িত্ব নেই; আমি এ বিষয়ে যেটুকু ইলম হাসিল করলাম, এর কি কোনো মূল্য নেই?

একটি হাদীস থেকে এর মূল্য জানা যায়। রাসূল (স) বলেছেন, "রাতের কিছু সময় ইলম শেখা ও শেখানো সারা রাত অন্য নফল আমল করার চেয়ে ভালো।" এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ওহীর ইলম চর্চা করা অন্য সব নফল আমলের তুলনায় বেশি মূল্যবান। তাই আমাদের উচিত, সবসময় ইসলামী বই সঙ্গে রাখা। যখনই এমন হয় যে, হাতে কোনো কাজ নেই তখনই ইসলামী বই পড়ে সময়টা এমন কাজে লাগাতে পারি, যা অনেক মূল্যবান।

শরীআতে অন্যান্য বিদ্যার মূল্য আছে কি?

মুসলমানের জীবনকে তো শরীআতমতোই চালাতে হবে। কেউ যদি ডাক্তারি বিদ্যা শেখে তাহলে শরীআতের হিসাবে এর কি কোনো মূল্য নেই? সে কি শরীআতের বাইরে চলে গেল?

একটি হাদীস থেকে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। রাসূল (স) বলেছেন, "হালাল কামাই করার চেষ্টা করা সব ফরযের পর ফরয।" এতে জানা গেল, নামায, রোযা ও অন্যান্য যত ফরয আছে সেসব যেমন ফরয, হালাল রোজগারের চেষ্টা করাও তেমনি ফরয।

রুজি-রোজগার করতে হলে কোনো একটা পেশা বাছাই করে নিতে হয়। যে পেশাই বাছাই করা হোক, এর জন্য যে বিদ্যা দরকার তা শিখতেই হয়। যে চিকিৎসার পেশা গ্রহণ করে তাকে ডাক্তারি বিদ্যা শিখতে হয়। যদি সে

www.pathagar.com

হালালভাবে কামাই করতে চায় তাহলে তাকে ঐ বিদ্যা ভালো করে শিখতে হবে। ডাক্তারি বিদ্যা ঠিকমতো না শিখে যদি চিকিৎসা করে রোগীর কাছ থেকে টাকা নেয় তাহলে তার আয় হালাল হবে না। তাই তার আয় হালাল করার জন্যই এ বিদ্যা শিখতে হবে। শরীআতের হিসাবে ডাক্তারি বিদ্যা ফরয নয়; কিন্তু যে চিকিৎসাকে পেশা বানিয়েছে তার রোজগারকে হালাল করার জন্যই ঐ বিদ্যা শেখা তার উপর ফরয।

এ উদাহরণ থেকে প্রমাণ হলো, মানুষের হালাল কামাই করার জন্য যেসব বিদ্যা শিখতে হয় তা সরাসরি ফরয না হলেও পরোক্ষভাবে ফরয। এসব বিদ্যা শেখা বেহুদা কাজ নয়। মানুষের খিদমতের জন্য যত রকমের পেশা দরকার সেসবের বিদ্যা পরোক্ষভাবে তাদের ওপর ফরয, যারা ঐসব পেশা গ্রহণ করে। যেসব পেশা হারাম সেসবের বিদ্যা শেখাও হারাম। যেমন– গণকি পেশা।

আমল

'আমল' (عَمَل) আরবী শব্দ। এর বাংলা হলো কাজ। মানুষ কোনো কাজের চিন্তা করলে ঐ কাজের সূচনা হয়। সে কাজের জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হলে তাকে আমল বা কাজ বলা হয়।

তাকদীর সম্পর্কীয় আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, কোনো কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করা হলেই কাজটি সমাধা না হলেও তা কাজ করা হয়েছে বলে ধরা হবে। কারণ, কাজটি সমাধা করা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, এটা মানুষের ইখতিয়ারে নেই। কাজটি সমাধা না হলেও কাজের ফল আখিরাতে দেওয়া হবে। কাজটি ভালো হলে পুরস্কার পাবে, মন্দ হলে শাস্তি পাবে।

মানুষ শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য দায়ী। কোনো কাজ কারো হাতে যদি ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই সমাধা হয়ে যায়, তাহলে এর জন্য তাকে দায়ী করা হয় না। যেমন– এক লোক পাখি শিকারের জন্য গাছে গুলি চালাল। গাছে যে একজন মানুষ ছিল তা সে জানত না। গুলি লেগে লোকটি মারা গেল। মেরে ফেলার কাজটি সমাধা হয়ে গেল। কিন্তু এ কাজের ইচ্ছা তো সে করেনি এবং এ উদ্দেশ্যে সে চেষ্টাও করেনি। আদালতে এ কথা প্রমাণিত হলে লোকটির কোনো শাস্তি হবে না। অথচ মেরে ফেলার কাজটি কিন্তু হয়েই গেল।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার বড়ই মেহেরবানী যে, যদি কেউ কোনো ভালো কাজ করার নিয়ত বা ইচ্ছা করে, কিন্তু এর জন্য চেষ্টা করার সময় বা সুযোগ না পায়, তবুও তিনি তাকে কিছু পুরস্কার দেবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের নিয়ত করে, তাহলে চেষ্টা না করা পর্যন্ত তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, বরং চেষ্টা না করার কারণে তাকে কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে বলে রাসূল (স) বলেছেন।

মানুষের আমলের হিসাব মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয় না

আদালতে আখিরাতে যখন মানুষের আমলনামা (দুনিয়ায় যা করেছে তার হিসাব) দেওয়া হবে, তখন যারা নেক আমল করেছে তাদের ডান হাতে এবং যারা বদ আমল করেছে তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। যারা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো চলেছে তারা নেক আমল করেছে বলে গণ্য হবে। আর যারা এর বিপরীত চলেছে তারা বদ আমল করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

আমলনামা হাতে পেয়ে নেক লোক ও বদ লোক সবাই দেখবে যে, দুনিয়ায় তারা যে পরিমাণ কাজ করেছে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি কাজের হিসাব সেখানে লেখা আছে। তখন সবাই আল্লাহকে ডেকে বলবে, আমরা তো এত কিছু করিনি, আমাদের হিসাবে এত আমল কেমন করে লেখা হলো? জবাবে আল্লাহ বলবেন, দুনিয়ায় বেঁচে থাকাকালে তোমরা যা কিছু করেছ তা তো লেখা আছেই; মৃত্যুর পরও তোমাদের আমল বন্ধ হয়নি। তোমরা অন্যদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছ, তোমাদেরকে করতে দেখে যারা করতে শিখেছে, তোমরা যাদেরকে করতে উৎসাহ দিয়েছ, তারা যা আমল করেছে তাও তোমাদের আমলনামায় যোগ হয়েছে। তোমাদের মৃত্যুর পরও তোমাদের আমলের হিসাব জারি ছিল। এ কথা নেক ও বদ উভয় রকমের আমলের বেলায়ই সত্য।

রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাজের পথ দেখায় সে তার মতোই, যে কাজ করে।" যে কাজ করে তার আমলনামায় যেমন সওয়াব বা গুনাহ লেখা হবে, যে ঐ কাজের পথ দেখায় তার আমলনামায়ও তা যোগ হবে। আমার চেষ্টায় যদি কোনো বেনামাযী নামাযী হয়ে যায়, তাহলে সারা জীবনে সে যত নামায আদায় করেছে, এর নেকী ঐ লোকের আমলনামায় যা হবে, আমার আমলনামায়ও তা-ই লেখা হবে। তাই মৃত্যুর পরও আমল জারি থাকে।

www.pathagar.com

সহীহ্ নিয়ত ছাড়া নেক আমলও কবুল হয় না

রাসূল (স) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই নিয়ত অনুযায়ীই আমলকে বিবেচনা করা হয়'। কোনো আমল দেখতে যত ভালো বলেই মনে হোক, কী নিয়তে কাজটি করা হয়েছে এর হিসাব নিয়েই আল্লাহ ঐ কাজটিকে কবুল করবেন।

হাদীসে আছে, হাশরের দিন এমন এক লোককে ডাকা হবে, যে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে। তাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ায় আমার জন্য তুমি কী করেছ? সে বলবে, আমি তোমার দীনের জন্য জিহাদ করে আমার জান কুরবান করে দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি এ নিয়তে জিহাদ করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর বলবে, বাহাদুর বলবে। তোমার ঐ নিয়ত আমি দুনিয়ায়ই পূরণ করে দিয়েছি। লোকেরা তোমাকে বীর বলেছে। আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নিয়ত তোমার ছিল না। তাই তোমাকে দোযখে দেওয়া হলো।

এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? লোকটি জিহাদের ময়দানে জান দিয়ে দেওয়ার পরও তাকে দোযখে যেতে হলো। এর একমাত্র কারণ, তার নিয়ত সহীহ্ ছিল না। প্রমাণ হলো, খাঁটি নিয়ত ছাড়া জিহাদের ময়দানে শহীদ হলেও কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। তাই আমলের ব্যাপারে নিয়তের বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি। নিয়ত সহীহ্ না হলে বড় নেক আমলেরও কোনো দাম নেই। তাহলে সহীহ্ নিয়ত সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার।

রাসূল (স) বলেছেন, "ঐ লোকই বুদ্ধিমান, যে তার নাফ্সকে দমন করে এবং যে কোনো কাজ করলে এর ফল আখিরাতে কী পাবে সে হিসাব করেই করে।" দুনিয়ায় নগদ কী ফল পাবে সে হিসাব করে কাজ করা একেবারেই বোকামি। যদি কেউ আখিরাতের হিসাব করে কাজ করে তাহলে— মিথ্যা কথা বলা, ওজনে কম দেওয়া, ঘুষ নেওয়া ইত্যাদি কোনোটাই করতে সে সাহস করবে না।

নিয়তকে খাঁটি করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে– আমি যে নেক আমলই করি, তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি (খুশি) ও আখিরাতের সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে করছি কি না। নিয়ত সহীহ্ হলেই আল্লাহ আমাদের আমল কবুল করবেন ও পুরস্কার দেবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করার সাথে সাথে আখিরাতের সফলতার কথাও খেয়ালে রাখতে হবে। আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকলেই আখিরাতে সফল হওয়া যাবে বটে; কিন্তু যেহেতু আখিরাতের সাফল্যই আসল উদ্দেশ্য, সেহেতু নিয়তের বেলায় 'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য'– এ দুটো কথা একসাথেই খেয়াল করা জরুরি।

www.pathagar.com

রাসূল (স) বলেছেন, শুধু আমলের কারণেই নাজাত পাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর রহমত হলেই মুক্তির আশা করা যায়। এতে বোঝা গেল– যত নেক আমলই করি না কেন, আল্লাহর দরবারে তা কবুল হওয়ার যোগ্য না হলে এবং তিনি দয়া না করলে উপায় নেই। তাই তাঁর দয়ার আশাই আসল ভরসা।

দীন ইসলামের কতক জরুরি বিষয়ে সঠিক ধারণা*

দীন ইসলামের এমন কতক বিষয় রয়েছে, যা সঠিকভাবে না জানলে পদে পদে ভুল ধারণা থেকে যাবে। তাই ঐ কয়টি বিষয়ে এখানে আলোচনা করছি :

১. মুহাম্মদ (স)-এর সাথে মুমিনের সম্পর্ক কেমন?

আমরা আগে জেনেছি যে, জীবনের সব দিকেই এবং সব সময়ই আল্লাহ আমাদের 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'। মুহাম্মদ (স) তেমনি জীবনে সব ক্ষেত্রে ও সব সময় 'একমাত্র আদর্শ নেতা'। নেতা তাকেই বলা হয়, যার পেছনে চলতে হয়, যার কথা মানতে হয়, যাকে অনুসরণ করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।" আদর্শ মানে যা অনুকরণযোগ্য। হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য সুন্দর করে অক্ষরগুলো লেখা বই আছে। ঐ সবকে বলে 'আদর্শলিপি'। লিপি মানে লেখা। এ বই দেখে নকল করতে থাকলে হাতের লেখা সুন্দর হয়।

তেমনি আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (স)-কে সুন্দর আদর্শ মানুষ বানিয়ে তাঁকে সব ব্যাপারে নকল করতে বলেছেন। তিনি যা বলেছেন ও যা করেছেন সবই সুন্দর বলে আল্লাহর ঐ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যা যা করতে হয় তা সবই তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনকে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করলে নেক মানুষ, সৎ মানুষ ও আদর্শ মানুষ হওয়া যাবে।

তিনি সবদিক দিয়েই সবার আদর্শ। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ শাসক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ বিচারক, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ বন্ধু ইত্যাদি।

---

* এ বিষয়ে আরো জানতে হলে পড়ুন : অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখা– 'দীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা'।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (স) আমাদের মতোই একজন মানুষ। তাই তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছেন আমাদেরও সেভাবে চলা সম্ভব। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যা কিছু করতে হয় তা সুন্দরভাবে করতে হলে তাঁর জীবন ও শিক্ষা থেকেই তা জানতে হবে। মৃত্যুর পরও এ মানুষটি ছাড়া আমার উপায় নেই। কবরে তাঁকে দেখানো হবে এবং তাঁকে চিনি কি না সে কথা জিজ্ঞেস করা হবে। দুনিয়াতে যারা তাঁকে মেনে চলে তারা তাঁকে দেখে চিনতে পারবে। চিনতে পারলেই কবরের বিপদ কেটে যাবে। হাশরের ময়দানে কঠিন পিপাসায় যে পানি পান করলে আর পিপাসার কষ্ট হবে না, সে পানির কর্তা হবেন তিনি। হাউজে কাউসার নামের বিশাল পুকুরের পানি সে-ই পাবে, যাকে তিনি দেবেন। আল্লাহর নিকট সুপারিশ (শাফাআত) করার জন্যও তাঁকে দরকার হবে। তাহলে দেখা গেল, তাঁকে ছাড়া দুনিয়ায়ও ঠিকভাবে চলা সম্ভব নয়, আখিরাতেও তিনি ছাড়া উপায় নেই।

আমরা যাদেরকে আপনজন মনে করি, তাদেরকে আমরা ভালোবাসি। রাসূল (স)-এর চেয়ে আপন আর কে হতে পারে? তাই তিনি বলেছেন, "পিতা-মাতা সন্তানাদি এমনকি দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে আমাকে যে বেশি ভালো না বাসে সে মুমিন নয়।" সত্যি তাঁর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কোনো মানুষ হতে পারে না। তাঁকে যে পরিমাণ ভালোবাসা হবে সে পরিমাণই তাঁকে মেনে চলা সম্ভব হবে।

তাই আল্লাহর যিক্‌র যেমন বেশি বেশি করতে হয়, তেমনি রাসূল (স)-এর উপর বেশি করে দরূদ পড়তে হবে।

সূরা আলে ইমরানের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে নবী! মানুষকে বলুন, যদি তোমরা সত্যি আল্লাহকে মহব্বত কর, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।" আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই রাসূলকে মেনে চলতে হবে।

রাসূল শুধু ধর্মনেতা নন, জীবনের সবদিকেই তিনি একমাত্র আদর্শ নেতা। তিনি ছাড়া আর কেউ আসল আদর্শ নয়। আমরা সাহাবায়ে কেরামকে কেন মানি? রাসূল (স)-কে কীভাবে মানতে হবে তা তাঁদের কাছ থেকেই আমরা শিখি। তাঁদেরকে মানার জন্য নয়, রাসূলকে মানার জন্যই তাঁদেরকে মানি। তাই আসল আদর্শ শুধু রাসূল (স)। অবশ্য রাসূলকে মানার ক্ষেত্রে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম আমাদের আদর্শ। সাহাবা মানে সাথী। তাঁরা যেভাবে রাসূল (স)-কে মেনেছেন, আমাদেরকেও সেভাবে মানতে হবে।

www.pathagar.com

২. কুরআন কেমন কিতাব?

মুসলিম জনগণ কুরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং সওয়াবের আশায় তিলাওয়াত করে। কুরআনে কী বলা হয়েছে তারা তা জানা ও বোঝার দরকার মনে করে না। অথচ আল্লাহ্ কুরআনকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। হিদায়াত মানে পথ দেখানো। কুরআনে কোন্ পথ দেখানো হয়েছে তা না জানলে কেমন করে তা মেনে চলা যাবে?

দুনিয়ার জীবনে যেভাবে চললে সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে এবং আখিরাতেও সফল হওয়া যাবে, সে হিদায়াতই কুরআনে আছে। তাই কুরআনকে বুঝতে হবে। না বুঝে শুধু তিলাওয়াত করার জন্য কুরআন নাযিল করা হয়নি। যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের কথা আলাদা। তারা কোনো রকমে তিলাওয়াত করলেও প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে নেকী পাবে বলে হাদীসে আছে। কিন্তু যারা দুনিয়ার সামান্য জীবনের সুখের জন্য ১৫/২০ বছর বিদেশী ভাষা শেখে, কুরআন বোঝার চেষ্টা করা কি তাদের কর্তব্য নয়? অল্প লেখা-পড়া জানলেও কুরআন বোঝার সুযোগ আছে। বাংলা ভাষায় কুরআনের বেশ কয়েকটি তাফসীর আছে।

যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তার জীবন থেকেই কুরআন বোঝা সহজ। রাসূলের জীবনের সাথে মিলিয়ে লেখা তাফসীর হলো 'তাফহীমুল কুরআন'। সকল তাফসীর মূল্যবান হলেও সবগুলো একই ধরনের নয়। সহজে কুরআনকে বোঝার জন্য 'তাফহীমুল কুরআন' সবচেয়ে বেশি সহায়ক। রাসূলের জীবনই আসল কুরআন, জীবন্ত কুরআন। এ তাফসীর সেভাবেই লিখিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতগুলোর শুধু অনুবাদ পড়ে কুরআন বোঝা যায় না। তাফসীর পড়তে হবে। কুরআনের ব্যাখ্যাকেই তাফসীর বলা হয়।[১]

৩. সবচেয়ে উঁচুমানের মুসলমান কারা?

আল্লাহ্ ও রাসূলের সার্টিফিকেট অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামই সবচেয়ে উঁচুমানের মুসলমান। তাঁরা সরাসরি রাসূল (স) থেকে ট্রেনিং পেয়েছেন। তাই তাঁদের জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি শেখার আছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা– হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) অন্যদের চেয়ে সেরা। তাই এ চার জনের জীবনী বেশি করে জানা দরকার।[২]

---

১. তাফহীমুল কুরআনের সারকথা সহজ বাংলায় জানতে হলে পড়ুন : অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখা– 'তাফহীমুল কুরআনের সারসংক্ষেপ'।

২. সাহাবাগণের জীবনী বাংলা ভাষায় প্রচুর রয়েছে, তাঁদের চর্চা বেশি হওয়া প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের চেয়ে বেশি মর্যাদা আর কারো নয়। পরবর্তীদের মধ্যে যারা ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে তাঁদের যত কাছাকাছি তারা ততই শ্রদ্ধার পাত্র।

উন্নত মুসলিম হিসেবে মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে যারা দীন শিখেছেন তাদেরকেই গণ্য করতে হবে। ইসলামী পরিভাষায় এঁদেরকে 'তাবেঈ' বলা হয়। যাঁরা তাবেঈগণের কাছ থেকে দীন শিখেছেন, তাঁদেরকে 'তাবে-তাবেঈ' বলা হয়। তাবেঈগণের পরেই তাবে-তাবেঈগণের মর্যাদা।

৪. দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী?

সাধারণত মনে করা হয় যে, নামায-রোযা, তাসবীহ-তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি হলো দীনদারী কাজ। আর আয়-রোজগার করা, বিয়ে-শাদি করা, খাওয়া-পরা ইত্যাদি দুনিয়াদারী কাজ।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রাসূল (স) যা কিছু করেছেন সবই দীনদারী। তিনি সব কিছু নবী হিসেবেই করেছেন। তিনি দেশ শাসন করেছেন, বিয়ে-শাদি করেছেন, যুদ্ধ করেছেন– এ সবই দীনদারী।

দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্যটা বুঝতে হবে। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো যা করা হয় সবই দীনদারী। আর যদি লোকদেখানোর জন্য নামায পড়া হয়, সুনামের উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া হয় এবং নিজের নামে হাজী লেখার জন্য হজ্জ করা হয় তাহলে এগুলোও দুনিয়াদারী। দুনিয়ার সব কাজই দীনদারীও হতে পারে; দুনিয়াদারীও হতে পারে।

রাসূল (স) বলেছেন, "যে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার ফজরের নামাযের জামাআতে শরীক হলো, তার ঘুমের সময়টা ইবাদত বলে গণ্য হবে।" বোঝা গেল, রাসূলের তরীকামতো ঘুমালে ঘুমটাও দীনদারীতে পরিণত হয়।

৫. ইবাদত কাকে বলে?

ইবাদত (عِبَادَةٌ) শব্দটি আরবী। আব্‌দ (عَبْدٌ) শব্দ থেকে ইবাদত শব্দটি গঠন করা হয়েছে। আব্‌দ মানে দাস। এ শব্দের সাথে আল্লাহর গুণবাচক শব্দ যোগ করে নাম রাখা হয়– আবদুর রহীম, আবদুর রাহমান, আবদুল কারীম ইত্যাদি। এ সব নামের অর্থ হলো আল্লাহর দাস।

www.pathagar.com

ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব বা দাসের কাজ। আল্লাহর গোলাম হিসেবে তাঁর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো যা করা হয় সেসবই আল্লাহর দাসত্ব। শুধু নামায-রোযাই ইবাদত নয়। আল্লাহর হুকুমমতো করলে সব কাজই ইবাদত।

অবশ্য একটু পার্থক্য আছে। নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত হলো বুনিয়াদী ইবাদত। এসব ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর দাসত্ব করার অভ্যাস করানো হয়; যাতে দুনিয়ার অন্য সব কাজ আল্লাহর পছন্দমতো করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ঐ চারটি ইবাদত অন্য সব কাজকে ইবাদত বানিয়ে দেয়। যেমন উপরে লেখা হাদীসে জানা গেল, নামায ঘুমকেও ইবাদত বানিয়ে দিতে পারে।

মুমিনের জীবনের দীনদারী ও দুনিয়াদারী আলাদা আলাদা নয়। গোটা জীবনই দীনদারী ও ইবাদত। মানুষের জীবন আল্লাহর দাসত্বের অধীন না হলে শয়তানের দাসত্বের অধীন হতে বাধ্য।*

৬. কুরআন ও হাদীস

আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সকল দিকের জন্যই ওহীর মাধ্যমে রাসূল (স)-এর কাছে বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন পাঠিয়েছেন। রাসূল (স) ঐসব বিধান শুধু মুখে শুনিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজে সব বিধান পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যেকোনো বিধান বুঝতে অসুবিধা মনে হলে, সাহাবায়ে কেরাম তা রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যেসব নিয়ম-প্রথা চালু ছিল সেসবের কোনোটি শরীআত অনুযায়ী আপত্তিকর হলে রাসূল (স) তা দূর করতে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল করেছেন, এর ভাষা আল্লাহ নিজে রচনা করেছেন এবং তা জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। এ ওহীকে 'ওহীয়ে মাতলূ' বলা হয়। মাতলূ মানে যা তিলাওয়াত করা হয়। রাসূল (স) জিবরাঈল (আ) থেকে শুনে তা তিলাওয়াত করে (মুখে উচ্চারণ করে) সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়েছেন।

এ কুরআন একসাথে সবটুকু নাযিল করা হয়নি। রাসূল (স)-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন একদিন হেরা পর্বতের গুহায় জিবরাঈল (আ) সূরা আলাক-এর প্রথম ৫টি আয়াত শুনিয়ে দেন। ৬৩ বছর বয়সে রাসূল (স) দুনিয়া থেকে বিদায় হন। এ ২৩ বছর ধরেই কিছু কিছু করে ১১৪টি সূরা নাযিল হয়।

---

* পড়ুন : অধ্যাপক গোলাম আযমের 'দীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা।

www.pathagar.com

কুরআনই শুধু ওহী নয়; হাদীসও ওহীর মধ্যে গণ্য। কুরআনের ভাষা ও ভাব সবটুকুই আল্লাহর রচনা আর হাদীসের ভাষা রাসূলের; ভাব আল্লাহর। কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া ও মানুষের জীবনকে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলার দায়িত্ব রাসূল (স)-কেই দেওয়া হয়েছে।

এ দায়িত্ব তিনি তিন রকমে পালন করেছেন। ১. মুখে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ২. নিজে করে দেখিয়েছেন, ৩. সাহাবীগণের দিকে তিনি খেয়াল রাখতেন এবং তাঁদের জীবনে যা আপত্তিকর দেখতেন তা দূর করতে বলতেন।

এসব তিনি ওহীর জ্ঞানের ভিত্তিতেই করতেন। এসব ইলমকে একসাথে হাদীস বা সুন্নাহ বলা হয়। রাসূল নিজের ভাষায়ই বলতেন, কিন্তু যা বলতেন এর ভাব আল্লাহর কাছ থেকে পেতেন। তিনি নিজের মন থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলতেন না। ওহীর জ্ঞান থেকে যা জানতেন তা-ই বলতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন। এ ওহী জিবরাঈল (আ) তিলওয়াত করে শুনিয়ে দেননি। এ ওহীর ভাব আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-এর মনে ঢেলে দিতেন এবং রাসূল (স) নিজের ভাষায় তা জানিয়ে দিতেন।

তিন রকম হাদীস

১. কাওলী হাদীস : হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কতক হাদীসের শুরুতে বলেন, 'রাসূল (স) বলেছেন', বা 'আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি'। এসব হাদীসকে 'কাওলী' বলা হয়। কাওল মানে কথা। রাসূল (স) কথায় যা জানিয়েছেন তা-ই কাওলী হাদীস।

২. ফে'লী হাদীস : হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী কতক হাদীসের শুরুতে বলেন, 'আমি রাসূল (স)-কে এ রকম করতে দেখেছি' বা 'রাসূল (স) এ রকম করেছেন'। ফে'ল মানে কাজ করা। রাসূল (স) কাজ করে যা জানিয়েছেন তা-ই ফে'লী হাদীস।

৩. তাকরীরী হাদীস : যেসব কথা বা কাজ সাহাবায়ে কেরামকে বলতে ও করতে দেখে রাসূল (স) আপত্তি জানাননি বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তাকরীরী হাদীস। 'তাকরীরী' শব্দের বাংলা অর্থ 'অনুমোদন' অর্থাৎ এসব রাসূল (স) অনুমোদন করেছেন বা সমর্থন করেছেন, কোনো আপত্তি করেননি।

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান

কুরআন-হাদীস থেকে আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান জানা যায়। আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের বিধানগুলো জানা খুবই জরুরি; যাতে আমরা তা মেনে চলতে পারি। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন– এসব দিকের ইসলামী বিধান না জানলে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন কেমন করে সম্ভব হবে।

একটিমাত্র বইয়ে এতসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা মোটেই সম্ভব নয়। এসব দিকের একেকটির জন্য অনেক বই লেখা হয়েছে। ঐসব বই থেকে অল্প কথায় একেকটি দিকের জন্য যে কয়টি বিধান জানা সবচেয়ে জরুরি মনে করেছি তা-ই এখানে উল্লেখ করছি। বিস্তারিত জানার জন্য যেসব বই পড়া উচিত তা ফুটনোটে লিখে দিচ্ছি।

ব্যক্তিজীবন

মানুষ আল্লাহর বড়ই আদরের সৃষ্টি। আসল মানুষ হলো রূহ। আদমের দেহ তৈরি হওয়ার পর আল্লাহ নিজের রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে আদমের দেহে এ রূহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন। দেহ বা নাফ্সের তাড়না ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ যাতে পশুর মতো না চলে সেজন্য নবীর মাধ্যমে সকল মানুষকে ডেকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

১. তোমাদেরকে যিনি পয়দা করেছেন শুধু তাঁর হুকুম মেনে চল, কারণ তিনি ছাড়া অন্য কাউকে তিনি তোমাদের হুকুমকর্তা প্রভু বানাননি। দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তোমাদের খিদমতে লাগিয়ে রেখেছেন। ফেরেশতারাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে, তোমাদের জন্য দোয়া করছে এবং তোমাদের মনে সুপরামর্শ দিচ্ছে।

২. দুনিয়ার জীবন অতি অল্প দিনের। মৃত্যুর পর আবার তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। এ জীবনে আল্লাহর মর্জিমতো চললে ঐ জীবনে সুখে থাকবে। পরকালের জীবনের শেষ নেই। তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। আর আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে।

৩. নবীর প্রতি ঈমান আন; তিনিও তোমাদের মতো মানুষ। দেখ তিনি মানুষ হয়েও এত ভালো যে, সবাই তাকে সবচেয়ে ভালো মানুষ বলে স্বীকার করে। তোমরা যদি ভালো মানুষ হতে চাও তাহলে নবীকে মেনে চল।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি এ কয়টি কথা মেনে নিল, সে আল্লাহর কাছে মুমিন হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে মুমিনকে দুনিয়ায় কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে কুরআনে আল্লাহ তাআলা তা জানিয়ে দিয়েছেন :

১. আল্লাহর হুকুম ঐভাবে পালন কর, যেভাবে রাসূল পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

২. শয়তানকে দুশমন মনে কর। সে সবসময় আল্লাহর হুকুম অমান্য করার তাগিদ দেয়।

৩. তোমাকে ভালো ও মন্দ চেনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নাফ্‌স তোমার মনে কু-ভাব জাগিয়ে দেয়। তোমার বিবেক তা সমর্থন করে না। তুমি বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবে না।

৪. তোমার দেহের বা নাফ্‌সের গোলাম হয়ে যেও না। দেহকে আল্লাহর গোলাম বানাও। এ উদ্দেশ্যেই নামায ও রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। সত্যিকার নামায মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

রাসূল (স) বলেছেন :

১. তোমার মগজে কী ঢুকছে এবং তোমার পেটে কী ঢুকছে তা পাহারা দাও। মনে শয়তান হাজারো কু-চিন্তা ঢোকনোর চেষ্টা করে। এমনভাবে পাহারা দাও, যাতে কোন কু-ভাব মনে জাগতে না পারে। তোমার পেটে যাতে কোনো হারাম খাবার না ঢোকে। তাই হালাল পথে আয়-রোজগার কর।

২. তোমার হাত ও মুখ দিয়ে কোনো মানুষকে কষ্ট দিও না। যতটুকু পার মানুষের উপকার কর। কারো ক্ষতি করবে না।

৩. যে কাজই কর, এ হিসাব করে করবে যে, আখিরাতে এ কাজের বদলা কী পাওয়া যাবে। শুধু দুনিয়ার নগদ লাভের লোভে কাজ করবে না। আখিরাতে সফল হওয়াই তোমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য যেন হয়। মনে রাখবে, তুমি দুনিয়ায় একাই এসেছ। কেউ তোমার সাথে আসেনি। মৃত্যুর পর তোমাকে একাই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তোমার বিচারও আলাদাভাবেই করা হবে। শাস্তি পেলে তোমাকে একাই তা সহ্য করতে হবে। কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।

ব্যক্তিগত জীবনে কোনো মানুষ যদি আল্লাহ ও রাসূলের এ ক'টি আদেশ মেনে চলে তাহলে সে দুনিয়াতেও সফল, আখিরাতেও সফল হবে।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন

দুনিয়ার পয়লা পরিবার আদম-হাওয়ার পরিবার। একজন পুরুষ ও একজন নারী নিয়েই পরিবার। সবচেয়ে ছোট্ট সমাজই হলো পরিবার। পরিবারই মানুষ গড়ার প্রথম কারখানা। ছোট সময় থেকে বাপ-মা সন্তানদেরকে যে রকম গড়তে চায়, তারা সে রকমই গড়ে ওঠে। পশুর বাচ্চাকে গড়ে তোলার জন্য বেশি সময় লাগে না। মানুষের সন্তানকে গড়তে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ বছর লাগে। পরিবার ছাড়া এটা সম্ভবই নয়। স্কুল-কলেজ-মাদরাসা-ইউনিভার্সিটিও মানুষ গড়ায় বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পরিবারের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই মানুষ গড়ার ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই পারিবারিক জীবনের জন্য আল্লাহ তাআলা বিস্তারিত আইন দিয়েছেন। যেমন–

১. ইসলামের পয়লা নির্দেশ হলো, বিয়ের বয়স হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া জরুরি; যাতে তাদের মন পবিত্র থাকে, চোখ সংযত হয় এবং সচ্চরিত্র বহাল রাখা সহজ হয়। এতে সমাজের পরিবেশ সুস্থ থাকে।

২. বিয়ের পাত্র ও পাত্রী বাছাই করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী পয়লা দেখা দরকার যে, বর ও কনে ভালো মুসলমান কি না। বংশ কেমন, দেখতে সুন্দর কি না বা আর্থিক অবস্থা ভালো কি না– এসব দেখা দোষের নয়। দীনের দিক দিয়ে যদি যোগ্য মনে না হয়, তাহলে ঐসব দিক যতই ভালো হোক তা বিবেচনা করা উচিত নয়। দীনের দিক দিয়ে মানমতো হলে এবং ঐসব দিকও ভালো হলে তো কথাই নেই।

৩. বিয়ের অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে হতে হবে, যাতে সমাজের লোকজন জানতে পারে যে, কোন্ ছেলে ও কোন্ মেয়ের মধ্যে বিয়ে হলো। গোপন বিবাহ ইসলামে জায়েয নেই। আমাদের দেশে যারা বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন, তাদেরকে কাযী বলা হয়। কাযীর সামনে বর ও কনে উপস্থিত হলে এবং কমপক্ষে দু'জন লোক সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকলেই বিয়ে হতে পারে।

   সাধারণত বিয়ের মজলিসে বর হাজির থাকে, কনে নিজে হাজির হয় না। কনে যে এ বিয়েতে রাজি এর প্রমাণ হিসেবে তিনজন লোক কনের পক্ষ থেকে হাজির থাকতে হবে। তিনজনের একজন কনের উকিল ও অন্য দু'জন সাক্ষী। উকিলকে বলতে হবে যে, কনে তাকে এ বরের সাথে বিয়ে দেওয়ার অনুমতি (এজিন) দিয়েছে এবং সাক্ষী দু'জনকে স্বীকার করতে

www.pathagar.com

হবে যে, কনে তাদের সামনেই এজিন দিয়েছে। এ তিনজন কনের এমন নিকটাত্মীয় হতে হবে, যাদের সামনে তাকে পর্দা করতে হয় না এবং যারা কনের আওয়াজও চেনে। কারণ, এজিন দেওয়ার সময় কনে ঘোমটা দিয়ে থাকে। তার চেহারা না দেখেই আওয়াজ থেকে মেয়েকে চিনতে হতে পারে।

আমাদের দেশে শরীআতবিরোধী কু-প্রথা আছে যে, উকিলের দু'জন সাক্ষীর মধ্যে একজন বরপক্ষের হতে হবে। এটা মোটেই জায়েয নয়। কনে উপস্থিত নেই বলে কনের পক্ষ থেকে তিনজন প্রতিনিধি থাকবে। এখানে বরপক্ষের কারো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ের মজলিসে কনের উকিল বরকে সম্বোধন করে বলবে, "আমি অমুক মেয়ের উকিল নিযুক্ত হয়ে এত টাকা মোহর ধার্য করে আপনার নিকট তাকে বিয়ে দিলাম।" বর বলবে, "আমি তাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করলাম"। এটাকে 'ইজাব-কবুল' বলা হয়। এভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান হলেই শরীআতমতো বিয়ে হয়ে গেল।

৪. শরীআতে মোহরানার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। মোহরানা বিয়ের একটি শর্ত। মোহরানা ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না। মোহরানা স্ত্রীর হক বা অধিকার। সাধারণত বিয়ের পূর্বে কনের সম্পত্তি থাকে না। তার পিতা মারা গেলে পিতার সম্পত্তি থাকলে সে ঐ সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়। তার কোনো সম্পত্তি থাকলেও শরীআত তাকে স্বামীর সংসারের খরচ বহন করতে বাধ্য করে না। ইসলাম স্বামীর উপর সংসারের খরচ বহন করার দায়িত্ব দিয়েছে।

স্ত্রীর কোনো সম্পত্তি না থাকলে এবং তার নিজের আয়ের ব্যবস্থা না থাকলেও যাতে স্ত্রী তার নিজের ইচ্ছামতো খরচ করার দরকার মনে করলে স্বামীর বা পিতার কাছে হাত পাততে বাধ্য না হয়, সেজন্যই মোহরানা ফরয করা হয়েছে। স্ত্রীর আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই মোহরানার উদ্দেশ্য। স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্মান বজায় রাখার জন্য তার হাতে কিছু টাকা-পয়সা থাকা জরুরি। বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসতে চাইলে তার হাতে কিছুই না থাকলে যাতায়াত খরচের জন্য স্বামীর কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে। শরীআত স্ত্রীকে সম্বলহীন অবস্থায় রাখতে চায় না।

শরীআত স্ত্রীকে এমন অধিকারও দিয়েছে যে, সে দাবি করতে পারে "আমাকে মোহরানার অর্ধেক দেওয়ার পর স্বামীর বাড়িতে যাব।" অবশ্য কোনো স্ত্রীই এ দাবি করে না; কিন্তু করার অধিকার তার আছে।

www.pathagar.com

মোহরানা কত ধার্য হবে এ বিষয়ে শরীআতের বিধান হলো কনের মা, খালা, বোন, ফুফুদের মোহরানার চেয়ে যেন কম না হয়। অর্থাৎ কনে যে পরিবারের কন্যা সে পরিবারের মান অনুযায়ী তার মোহরানা ধার্য হওয়া উচিত; যাতে তার মর্যাদা বহাল থাকে। স্বামীর মোহরানা আদায় করার সাধ্য আছে কি না এর ভিত্তিতে মোহরানা ধার্য হওয়া নিয়ম নয়। তবে সবদিক দিয়ে বর পছন্দ হলে কনেপক্ষ মোহরানা বরের সাধ্যের বেশি চাপিয়ে দেয় না। দু'পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মোহরানা ধার্য হতে পারে।

মোহ্রানার ব্যাপারে একটা মারাত্মক ভুল ধারণা এদেশে আছে। ইসলাম সম্বন্ধে না জানার কারণে এবং যেটুকু জানে তাও না মানার কু-অভ্যাসের ফলে কতক লোক মোহরানা আদায় করতেই চায় না। এটা আদায় করা না হলে যে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে, সে কথার পরওয়াই নেই। তারা মনে করে যে, মরার সময় স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিলেই চলবে। মৃত্যুর সময় স্ত্রী হয়তো আবেগের কারণে মাফ করতে রাজি হতে পারে। কিন্তু এ যুলুম আল্লাহ্ সহ্য করবেন না। কারণ, সে স্ত্রীর হক না দিয়ে ফাঁকি দিয়েছে।

৫. শরীআতবিরোধী যৌতুকের মারাত্মক কু-প্রথা সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। কনের পিতামাতা খুশি হয়ে জামাতাকে যা উপহার হিসেবে দেয় তা যৌতুক নয়। বরের পক্ষ থেকে কনেপক্ষের কাছে কোনো জিনিস বা টাকা-পয়সা দাবি করলে সেটাই যৌতুক। এ রকম দাবি করার কোনো অধিকার বরের নেই। কনের পিতার সম্পদের লোভ করা এবং তা দাবি করা জঘন্য রকমের জুলুম। তাই এটা শরীআতে হারাম।

এ কু-প্রথা মুসলিম সমাজে আগে ছিল না। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজে এ প্রথা চালু ছিল। হিন্দু ধর্মে মেয়েরা পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না। তাই কনের পিতা বিয়ের সময়ই মেয়েকে কিছু সম্পদ দিয়ে বিদায় করে।

যারা যৌতুক দাবি করে, তারা চরম বেহায়া ও ছিনতাইকারী। জোর করে কনের পিতার সম্পত্তি দখল করতে চায়। এর জন্য কনের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এরা পশুর চেয়েও হিংস্র। যারা এ রকম হীন-লোভী তারা স্ত্রীর পাওনা মোহরানা না দিয়ে উল্টা স্ত্রী থেকে 'মোহরানা' দাবি করে। শরীআত স্ত্রীকে মোহরানার অধিকার দিয়েছে। অথচ

www.pathagar.com

শরীআতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একশ্রেণীর স্বামী যৌতুকের নামে স্ত্রীর কাছে 'মোহরানা' চায়। যৌতুক নগদ আদায় করতে হয়। স্ত্রীর মোহরানা বাকির খাতায় থাকে।

আমাদের দেশে যৌতুকবিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও দিন দিন যৌতুক বেড়েই চলেছে। দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন নেই বলেই যৌতুক বন্ধ হচ্ছে না। সামাজিক রোগ শুধু আইন দিয়ে দূর করা যায় না। যারা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলে তারা যৌতুকের দাবি করে না। কারণ তারা জানে যে, যৌতুক দাবি করা হারাম।

৬. আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে স্বামীর বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন; দাসী বানিয়ে দেননি। সূরা আর্ রূমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে পয়দা করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া দান করেছেন।" আল্লাহ স্ত্রীকে স্বামীর জীবনসাথী বানিয়েছেন। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন ও সুখ-দুঃখের সাথী। দু'জনকে মিলে-মিশে ও পরামর্শ করেই সুখের সংসার গড়তে হয়, সন্তানকে মানুষ করতে হয়। আল্লাহ স্ত্রীকে স্বামীর হুকুমের গোলাম বানাননি। স্বামীর ন্যায়-হুকুম স্ত্রীকে মানতে হবে বটে, কিন্তু স্ত্রী চাকরের মতো নয়। স্বামীর সংসারে স্ত্রী হলো রানী, চাকরানি নয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে মতের অমিল হতে পারে, তর্ক-বিতর্কও হতে পারে। মতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে বন্ধুর মতোই মীমাংসায় পৌঁছবে। ভালোবাসাই মীমাংসায় পৌঁছিয়ে দেবে। বাড়ির কাজের মানুষ ও সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে গাল-মন্দ বলা বা তাকে অপমান করা কোনো বুদ্ধিমান স্বামীর কাজ হতে পারে না। তা করলে তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবে এবং সে সংসারে রানীর দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বন্ধু ও ভালোবাসার পাত্রকে কেউ অপমান করে না।

৭. কুরআনে স্বামী-স্ত্রীকে 'একে অপরের পোশাক' বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা হিসেবে ও লজ্জাস্থান ঢাকার উদ্দেশ্যে পোশাক নাযিল করেছি।" তাহলো তারা দু'জন একে অপরের জন্য সজ্জা এবং দু'জনেই যৌন-তৃপ্তি ভোগ করার কারণে বাইরে কোথাও লজ্জাকর কাজ করবে না। এখানে আল্লাহ তাআলা দু'জনকেই সমান মর্যাদা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৮. সংসারের খরচ যোগাড় করার দায়িত্ব স্বামীর, স্ত্রীর নয়। তাই স্ত্রীর জন্য আয়-রোজগারের চেষ্টা করা জরুরি নয়। সংসারে স্ত্রীর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যদি আয় করার সুযোগ হয় তাহলে স্ত্রী তা করতে পারে; অবশ্য স্বামীর সম্মতি নিতে হবে। স্বামী ও স্ত্রী আপসে সমঝোতা করে সব কিছুই করতে পারে।

৯. আল্লাহ তাআলা একটি বিষয়ে স্বামীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব হলো পরিচালনার দায়িত্ব। এক দেশে যেমন দুটো সরকার চলতে পারে না, দু'জন হেডমাস্টারের পরিচালনায় কোনো স্কুল চলে না, তেমনি পরিবারও যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান সেহেতু এখানে স্বামী ও স্ত্রীর সমান নেতৃত্ব সম্ভব নয়। পরিবার পরিচালনায় স্বামী অবশ্যই স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে। কিন্তু কোনো বিষয়ে দু'জনের অভিমত যদি দু'রকম হয়ে যায় এবং কিছুতেই একমত হওয়া না যায় তাহলে শেষ ফায়সালা কীভাবে হবে– সেক্ষেত্রে স্বামীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য স্ত্রীকে রাজি হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই।

১০. সূরা আর্ রূমের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া দান করেছেন। ৬ নং পয়েন্টে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা কথাটি আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দয়া-মায়ার বিষয়টি আলোচনা করছি।

দু'জনই যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন দু'জনই দু'জনের দয়া-মায়ার কাঙ্গাল হয়ে পড়ে। তখন একজন অপরজনের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। দয়া-মায়ার সম্পর্কটা সারা জীবনেই দরকার। অসুখ-বিসুখে দু'জনই দু'জনের প্রতি দয়াবান না হলে চলতেই পারে না। কিন্তু বুড়া বয়সে এটা সবচেয়ে বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। তখন উঠতে-বসতে, চলা-ফেরা করতে সবসময় একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হয়।

বিশেষ করে বুড়ার জীবনে বুড়িই সবচেয়ে আপন মনে হয়। ছেলে-পেলে, নাতি-নাতনীরা যার যার কাজে ব্যস্ত। বুড়ার সাথে কিছু সময় বসে কথা বলার ফুরসৎ কারো নেই। একমাত্র সাথী বুড়ি। কথার সাথী হিসেবে এর কোনো তুলনাও নেই, বিকল্পও নেই।

স্বামী যদি আগে মারা যায় তাহলেও বুড়ির এত অসুবিধা হয় না, বৌমা, নাতি-নাতনীদেরকে সাথী হিসেবে পেয়ে যায়। তার খিদমত করার জন্য দরকার হলে সবসময়ের জন্য কাজের মেয়ে রাখা যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু বুড়ি আগে মারা গেলে বুড়া একেবারেই 'ইয়াতীম' হয়ে পড়ে। স্বামী তখন জীবনসাথীকে হারিয়ে একা হয়ে যায়। তার চেয়ে বেশি অসহায় যেন আর কেউ নেই। স্ত্রী যে কত বড় নিয়ামত সে কথা তখন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। যখন বিছানায়ই খাওয়া-দাওয়া ও পেশাব-পায়খানা করতে হয়, তখন স্ত্রীর দয়া-মায়ার অভাব অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

১১. রাসূল (স) স্বামী-স্ত্রীকে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যদি দু'জনেই দুনিয়ায় নেকভাবে জীবন কাটায় তাহলে তারা বেহেশতেও একসাথে থাকবে। বেহেশতের আটটি শ্রেণী আছে। একজন উপরের শ্রেণী আর অন্যজন যদি নিচের শ্রেণীতে থাকে তাহলে নিচেরজনকে প্রমোশন দিয়ে উপরের শ্রেণীতে নিয়ে তাদেরকে একত্র করা হবে। তাই স্বামী ও স্ত্রী শুধু দুনিয়াতেই জীবনসাথী নয়, আখিরাতেও তারা সাথী হিসেবেই থাকবে এবং একজনের কারণে অন্যজন প্রমোশন পাবে।

পারিবারিক জীবনের যে চমৎকার বিধান ইসলাম দিয়েছে এর চেয়ে সুন্দর, মধুর ও আবেগময় বিধান আর কোথায় পাওয়া যাবে!

তালাক

তালাক অর্থ স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ দুজনের মধ্যে মহব্বত ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া বড়ই বেদনার বিষয়। এ সম্পর্ক আখিরাতেও কায়েম থাকুক এটাই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন।

কিন্তু কতক সঙ্গত কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি মিলমিশ না হয়, অথবা তারা যদি আলাদা হতেই চায় তাহলে তাদেরকে তালাকের অনুমতিও আল্লাহ দিয়েছেন। রাসূল (স) বলেছেন, 'সকল জায়েয কাজের মধ্যে তালাক হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ।'

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো পবিত্র সম্পর্ক, রাগের মাথায় হঠাৎ ভেঙ্গে দেওয়ার মতো জিনিস নয়। বিশেষ করে সন্তান থাকলে তালাক তাদের জন্য এক মহাবিপদ। ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভেবেচিন্তে তালাকের মতো কঠিন বিষয়ের ফায়সালা করা উচিত। কিছু লোক রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেলে। যখন হুঁশ ফিরে তখনি স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য হারাম পথ তালাশ করে। এর চাইতে বিশ্রী কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামে তালাকের নিয়ম

ধীরে সুস্থে খুব ভালো করে সবদিক বিবেচনার করার পর যদি তালাক দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই না থাকে তাহলে ইসলামের দেওয়া নিয়মে তালাক দিতে হবে, যাতে গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। নিচে ঐ নিয়মগুলো দেওয়া হল :

১. স্বামী ও স্ত্রীর দু'পক্ষের আত্মীয়গণ বৈঠকে বসে আপসে আলোচনা করে তালাকের ফায়সালা করতে পারেন। এ তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

২. স্বামী যদি স্ত্রীকে একতরফা তালাক দিতে চায় তাহলে সাবধান হতে হবে, যেন রাগের মাথায় ও স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া না হয়। স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর প্রথমে এক তালাক দিতে হবে। কেননা একসাথে তিন তালাক দেওয়া নিষেধ।

৩. তালাক দেওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রী এক বাড়িতেই থাকবে। স্বামী ইচ্ছা করলে ৩ হায়েয শেষ হওয়ার আগে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তিন হায়েয পার হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে।

৪. স্বামী যদি আবার এক তালাক দেয় তাহলে ঐ নিয়মেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

৫. যদি সে আবার তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এ তালাকী মহিলাকে আর কেউ বিয়ে করার পর যদি সে স্বামী মারা যায় বা নিজের ইচ্ছায় তাকে তালাক দেয়, তাহলে আগের স্বামী আবার ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে।

৬. বিয়ে রেজিস্ট্রি করার সময় স্বামী কাবিনের নিয়ম অনুযায়ী কতক শর্ত পালনের ওয়াদা করে। ঐ ওয়াদা ভঙ্গ করলে স্ত্রী নিজেও তালাক নিতে পারবে বলে স্বামী তাকে ক্ষমতা দেয়। ঐ ক্ষমতা বলে স্ত্রী কাজী অফিসের মাধ্যমে তালাক নিতে পারে। এ জাতীয় তালাককে তালাকে তাফভীয বলা হয়।

পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক

পরিবার মানে শুধু স্বামী-স্ত্রীই বোঝায় না। অবশ্য পরিবারের মূলই হলো স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর পিতা-মাতা থাকলে তাদের সন্তান হিসেবে স্বামীকে

www.pathagar.com

পিতা-মাতার খিদমতের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। স্ত্রীকেও মনোযোগ দিয়ে তার শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন করতে হবে।

১. পিতা-মাতা যদি বৃদ্ধ হয়, তাহলে তাঁদের খিদমত করে বেহেশত খরিদ করার জযবা স্বামীর দিলে থাকতে হবে। তাঁদের প্রতি কোনো সময় একটু বিরক্ত হওয়া থেকেও সাবধান থাকতে হবে।

পিতা-মাতা জীবিত থাকুক বা মৃত হোক তাঁদের জন্য প্রতি নামাযের পর এবং যখনই মনে হয় আল্লাহর শেখানো দোয়া পড়া উচিত :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا .

অর্থাৎ "হে আমার রব! আমার পিতা-মাতা ছোট সময়ে আমার উপর যেমন রহম করেছেন, তুমিও তাদের উপর তেমনি রহম কর।"

ক. সন্তানের ভালো নাম রাখতে হবে। সুন্দর অর্থ হয় এমন নাম রাখাই উচিত। রাসূল (স) বলেছেন, 'আল্লাহর দাস বা দাসী' অর্থ হয় এমন নাম সবচেয়ে ভালো।

খ. সন্তান জন্মের সাত দিনের দিন আকীকা করতে পারলে করবে। এটা অবশ্য জরুরি নয়। সাধ্য থাকলে দেবে।

গ. রাসূল (স) বলেছেন, পিতা-মাতা সন্তানকে সবচেয়ে বড় যা দান করতে পারে, তা হলো সুশিক্ষা। শিশুর মুখে কথা ফোটার শুরুতেই মুখে আল্লাহর নাম তুলে দিলে কচি মুখে কতই না সুন্দর শোনায়। দুই থেকে চার বছর বয়সের মধ্যে মুখে মুখে কালেমা তাইয়েবা, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ সূরা, ছোট ছোট দোয়া শেখানো যায়। তিন বছর বয়স থেকেই আরবী অক্ষর ও বাংলা অক্ষরের সাথে পরিচিত করানো যায়। প্রতি অক্ষরের সাথে ছবিসহ ছড়া ও কবিতার বই পাওয়া যায়। তা থেকে মুখে মুখেই শেখানো সম্ভব। পাঁচ বছর বয়স হলেই স্কুলে বা মাদরাসায় ভর্তি করালে শিক্ষাজীবন শুরু হয়ে যায়। এ বয়স থেকেই আদব-কায়দা শেখাতে হয়।

ঘ. ৭ বছর বয়স হলেই নামাযের অভ্যাস করানো শুরু করতে হবে। স্কুলে পড়ার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। মাদরাসায় ভর্তি করালে সেখানেই কুরআন শেখার সুযোগ পেয়ে যায়।

www.pathagar.com

৪. মায়েরা সংসারের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুদের দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে শিশু সন্তানকে চড়-থাপড় দেয়। এটা খুবই বদ অভ্যাস। ৪/৫ বছর পযন্ত শিশুকে মারলে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। মেরে সংশোধনের বয়স ওটা নয়। ৬/৭ বছর থেকে শাসনের উদ্দেশ্যে মারলে উপকার হতে পারে। তবে মেরে নয়, সোহাগ করেও শাসন করা যায়। রাগ দেখানোর বদলে আদর দিয়ে সংশোধন করার যোগ্যতা হাসিল করতে হবে। স্নেহের শাসন হলে সন্তান পিতা-মাতাকে ভয়ের বদলে ভালোবাসতে শেখে।

৫. সন্তানদেরকে কাপড়-চোপড় বা অন্য কোনো জিনিস দিলে সবাইকে সমান মানে দিতে হবে। যত্নের দিক দিয়ে ছেলে ও মেয়েকে সমান চোখে দেখতে হবে।

৬. কোনো সময় সন্তানকে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে তাকে অন্যদের সামনে নয়, আলাদাভাবে শাসন করতে হবে। বিশেষ করে ছোট ভাই-বোনদের সামনে ধমক দিলে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান নষ্ট হয়।

৭. সন্তানদের জন্য বেশি করে কুরআনে শেখানো দোয়া করতে থাকা দরকার :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থাৎ "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে এমন বানাও, যাতে তাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক দাও।" (ফুরকান : ৭৪)

৮. পরিবারের পরিবেশকে মধুর ও সুন্দর রাখতে হলে :

ক. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হলেও তা অন্যদের সামনে যেন না হয়।

খ. স্বামীর ভাইদের সাথে পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

গ. স্বামীর কোনো ভাই-এর বিয়ে হলে তাদের সংসার আলাদা ঘরে হতে হবে।

ঘ. পরিবারের বড় ভাইকে উদার হতে হবে, যাতে ছোট ভাইয়েরা তাকে পিতার মতো মানে। রাসূল (স) বলেছেন, "পিতার পর বড় ভাইকে পিতার স্থানে মনে করবে।"

ঙ. পরিবারের মুরব্বি পিতা বা মাতা মারা গেলে তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি শরীআতমতো সকল ভাই-বোনদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। বোনদেরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। সম্পত্তির কারণেই মধুর সম্পর্ক নষ্ট হয়। শরীআতকে মানলে সম্পর্ক সুন্দর থাকে।

www.pathagar.com

৯. পিতা যদি এমন বয়সের ছেলে-মেয়ে রেখে মারা যান, যাদেরকে লালন-পালন করা জরুরি, তাহলে পিতার বড় ছেলেকে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। বড় ভাই পিতার মতো বলে রাসূল (স) বলেছেন। বড় ভাই তার ছোট ভাইকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সময় পর্যন্ত নিজের ছেলের মতো গড়ে তুলবে। ছোট বোনকে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যা কিছু করণীয় তা করবে।

পিতা সম্পত্তি রেখে গেলে বড় ভাই তা থেকে ছোট ভাই-বোনের প্রয়োজন পূরণ করবে। যদি পিতার সম্পত্তি না থাকে তাহলে নিজের সম্পদ থেকেই এ দায়িত্ব পালন করবে। যদি এতে অক্ষম হয় তাহলে বংশের অন্যদের সাহায্য নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করবে। আর্থিক সাধ্য না থাকার অজুহাতে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে এ দায়িত্বের বোঝা বহন করতে থাকলে আত্মীয়-স্বজনও সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে। যে আন্তরিকতার সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন এবং তাকে তাওফীক দান করেন।

১০. পিতা জীবিত থাকাকালেই তার কোনো ছেলে যদি সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে দাদা হিসেবে ঐ সন্তানদের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। তিনি মারা গেলে ঐ নাতি-নাতনীরা তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না। তাই শরীআতে অসিয়তের যে বিধান রয়েছে সে নিয়ম মেনে তার সম্পত্তির এ পরিমাণ অংশ ইয়াতীম নাতি-নাতনীদেরকে দেবে, যা তাদের পিতা জীবিত থাকলে ওয়ারিশ হিসেবে পেত।

সাধারণত দেখা যায়, ঐ ইয়াতীমদের চাচারা তাদের পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির কোনো অংশই দিতে চায় না। তাই তাদের দাদাকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। মৃত ছেলের ইয়াতীম সন্তানদের প্রতি দাদার দরদ অত্যন্ত বেশি হওয়ার কথা। তাই অসিয়তের মাধ্যমে দাদাকেই ইয়াতীম নাতি-নাতনীদের জন্য সুব্যবস্থা করে যেতে হবে। তা না হলে তাদেরকে ভিক্ষা করে খেতে হবে। কোনো দাদারই নিজের নাতি-নাতনীদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে যাওয়া উচিত নয়। চাচাদেরও নিষ্ঠুর হওয়া অপরাধ। আপন বংশের ছেলে-মেয়েদের প্রতি তাদের দরদ থাকা শরীআতেরই দাবি।

www.pathagar.com

ধর্মীয় জীবন

আল্লাহ, রাসূল (স), কুরআন ও আখিরাতে বিশ্বাস ইত্যাদিকে ধর্মীয় বিষয় অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুসলমানের জীবনে দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা ঐসব বিশ্বাসের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয় বলে তাদের ধর্মীয় জীবন দুনিয়ার অন্যান্য দিক থেকে আলাদা নয়। নামায-রোযা বাস্তব জীবনকে আল্লাহর মর্জিমতো চলার যোগ্য বানায়। নামায-রোযা হিন্দু ধর্মের পূজা ও উপবাসের মতো বাস্তব জীবন থেকে সম্পর্কহীন নয়।

খ্রিস্টানরা 'গড'কে বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিস্টকে গডের পুত্র বলে মনে করে, রবিবারে গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে। তাদের এসব ধর্মীয় বিষয়ের সাথে তাদের বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ঐসব ধর্মীয় বিষয়ের কোনো প্রভাব নেই। তাদের ধর্মীয় জীবন তাদের দুনিয়াদারী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

হিন্দুরা ভগবানে বিশ্বাস করে, দেব-দেবীর পূজা করে, মন্দিরে উপাসনা করে। কিন্তু তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশ শাসনের সাথে ঐসব ধর্মীয় কাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলাম ঐ জাতীয় কোনো ধর্ম নয়। তাই মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের গোটা জীবনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী পরিচালনা করার তাগিদ দেয়। তাদের নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যাপন করার অভ্যাস শিক্ষা দেয়।

মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনকে বিশেষ যত্নের সাথে উন্নত করা দরকার; যাতে তাদের বাস্তব জীবন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চলে এবং নামায-রোযা তাদের দুনিয়ার জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে।

তাই মুসলিমদের ধর্মীয় জীবনকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে যা যা করা উচিত তা উল্লেখ করছি :

১. ছোট বয়সেই কুরআন শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া শিখতে হবে।

২. মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায়ের অভ্যাস করতে হবে। বড়রা নামাযে যাওয়ার সময় যেন ছোটদেরকে আদর করে সাথে নিয়ে যায়।

৩. প্রতিদিন ফজরের পর কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব কুরআন বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

৪. নামাযের পর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তাই অল্প সময় হলেও পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোয়া করতে হবে।

www.pathagar.com

৫. সামান্য লেখাপড়া জানলেও ইসলামী বই সব সময় সাথে রাখতে হবে, যাতে যখনই সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়, ইসলামের জ্ঞান বাড়ানো যায়। আসলে মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো ইসলাম সম্পর্কে বেশি বেশি জানা।

৬. কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা করা উচিত নয়, তা বোঝার যোগ্যতা বিবেকের আছে। তাই বিবেকের বিরুদ্ধে চলব না– এ ফায়সালা করতে পারলে নিজেকে মন্দ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, পাপ কী? তিনি এ প্রশ্নের জবাব একবার দিলেন এভাবে– "তোমার বিবেকে যা খট্‌কা লাগে তা-ই গুনাহ।" আরেকজনকে এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস কর'। তাই বিবেকের শক্তি বাড়াতে হবে। বিবেকের বিরুদ্ধে চলতে থাকলে বিবেক দুর্বল হতে থাকে। আর বিবেকের কথামতো চলতে থাকলে বিবেক শক্তিশালী হয়। বিবেকই রূহ ও আসল মানুষ।

৭. মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার আলেম শিক্ষকের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখতে হবে। তাহলে দীনের কথা যা জানা নেই, তাদের কাছ থেকে তা জানা সহজ হবে।

৮. আয়-রোজগার হালাল পথে তালাশ করতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, হারাম আয়ের দ্বারা শরীরে যতটুকু রক্ত-মাংস হয় তা দোযখে যাবে। এর মানে হলো হারাম খেলে দোযখে যেতে হবে। এ বিষয়টা মুসলমানদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে হবে।

৯. ঈমান, ইলম ও আমলের চর্চা করে এমন কোনো সংগঠন এলাকায় থাকলে এর সাথে মিলে কাজ করতে হবে। একের বেশি সংগঠন থাকলে ভালো করে যাচাই-বাছাই করে যেটা বেশি ভালো মনে হয় এর সাথেই কাজ করতে হবে। কারণ ইসলামী সংগঠন করা ফরয।

১০. শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস করতে হবে। এ দ্বারা আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেষ রাতের দোয়া বেশি কবুল হয়। শেষ রাতে সবাই যখন ঘুমায় তখন আল্লাহ ডাকতে থাকেন– "কে আছ আমাকে ডাক, সাড়া দেব; কে আছ গুনাহ মাফ চাও, মাফ করে দেব।" এভাবে আল্লাহর সাথে এমন সম্পর্ক হয় যে, সব সময় তাঁরই উপর ভরসা করে ঈমানী শক্তি বাড়ানো যায়।

শেষরাতে আল্লাহর দরবারে ধরনা দেওয়ার সেরা সময় ও সুযোগ রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছু শুধু তাঁর কাছেই চাইতে থাকলে অন্য কারো সাহায্যের দরকার হয় না। তাঁর দরবারে মন খুলে সব বলা যায়। শেষরাতে গুনাহ মাফ

www.pathagar.com

চেয়ে কাঁদতে যে মজা পাওয়া যায় তা মনে তৃপ্তি দেয়। সূরা ফাতিহায় إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ পড়া হয়। এর মানে "শুধু তোমারই গোলামি করি, আর শুধু তোমারই সাহায্য চাই।" আল্লাহর শেখানো এ কথা অনুযায়ী শুধু তাঁরই নিকট হাত পেতে রাখলে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণ পাওয়ার আশা করা যায়।

তাওবা

আরবী 'তাওবা' শব্দটির অর্থ হলো ফিরে আসা। মানুষ যখন বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তখন সে গুনাহ্ করে। আর গুনাহ্ করলে সে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যায়। যে পরিমাণ গুনাহ করা হয় আল্লাহর সাথে সে পরিমাণ দূরত্বই সৃষ্টি হয়।

যেমন– ছেলে পিতার হুকুম অমান্য করলে সে নিজেই টের পায় যে, সে পিতা থেকে দূরে সরে গেছে। তখন সে বাবার সামনে আসতে সাহস পায় না, পালিয়ে থাকার চেষ্টা করে। যদি সে সাহস করে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা তার পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে মাফ চায় এবং আর কখনও এমন করবে না বলে ওয়াদা করে, তাহলে ঐ দূরত্ব আর বাকি থাকে না। পিতা তাকে শাস্তি দেওয়ার বদলে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন, তার চোখ মুছে দেন এবং ছেলে আবাধ্য হওয়ায় তার মনে যে রাগ ছিল তা চলে যায়। এমন কি এরপর থেকে অনুতপ্ত ছেলের প্রতি তার স্নেহ আগের চেয়েও বেড়ে যায়।

এ উদাহরণ থেকেই তাওবা'র অর্থ সহজে বোঝা যায়। তাওবা মানে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। তিনটি কাজ মিলে তাওবা পূর্ণ হয় :

১. যখনই কোনো গুনাহের কাজ হয়ে যায় তখন আর দেরি না করে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে হবে। আফসোস করতে হবে (হায় হায়! আমি এটা কী করলাম?) এবং আল্লাহর নিকট লজ্জিত হতে হবে।
২. কাতরভাবে চোখের পানি ফেলে কৃত গুনাহর জন্য মাফ চাইতে হবে।
৩. আর কখনও এমন কাজ করব না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আবার গুনাহ হয়ে গেলে আবার তাওবা করতে হবে এবং নিজের উপর কিছু জরিমানাও ধার্য করতে হবে। যেমন– কয়েক রাকাআত নফল নামায, কিছু নফল রোযা ও আল্লাহর পথে কিছু খরচ করা। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে তিনি নিষেধ করেছেন। যত বড় গুনাহ-ই হয়ে যাক, হতাশ না হয়ে অনবরত তাওবা করতে হবে। আল্লাহ্ মানুষের নিকট এ দাবি করেননি যে, কোনো সময়ই যেন তোমাদের থেকে কোনো গুনাহ্ না হয়। কারণ, নবী ছাড়া সবারই গুনাহ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ যা চান তাহলো গুনাহ্ হওয়ার সাথে সাথেই যেন তাওবা করা হয়। রাসূল (স) স্বয়ং রোজ ৭০ বার গুনাহ্ মাফ চেয়েছেন। অথচ তাঁর কোনো গুনাহ-ই ছিল না।

www.pathagar.com

সামাজিক জীবন

শহরে হোক আর গ্রামেই হোক, মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে বসবাস করে। এ রকম কতক বাড়ি মিলে কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের এলাকাকে শহরে মহল্লা বলে, গ্রামে বলে পাড়া। শহরে কয়েকটি মহল্লা মিলে একটি ওয়ার্ড গঠিত হয়। গ্রামেও কয়েকটি গ্রাম মিলে ইউনিয়নের একেকটি ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য হয়।

যারা কাছাকাছি এলাকায় থাকে, চলাফেরা করতে ও হাট-বাজারে যেতে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এসব পরিচিত মহলকেই সমাজ বলা যায়। মুসলিম সমাজের কেন্দ্র হলো মসজিদ। মুসলমানরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানে জামাআতে নামায আদায় করার জন্য অবশ্যই মসজিদ তৈরি করা হয়। শহরে প্রতি মহল্লায়ই মসজিদ দেখা যায়। বড় গ্রাম হলে এক গ্রামে একাধিক মসজিদও থাকে।

একটি মসজিদে যতটুকু এলাকার লোক জুমুআর নামাযে একত্র হয়, তাদেরকে ঐ মসজিদের ভিত্তিতে একটি সমাজ হিসেবে গণ্য করা যায়। মুসলিম সমাজের কেন্দ্র মসজিদ হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলিমদের সমাজজীবনের বিধি-বিধান কেমন তা আলোচনা করছি :

১. ঐ সমাজের এলাকায় যারা থাকে তাদের মধ্যে পুরুষদের সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআতে আদায় করা উচিত। অন্তত জুমুআর নামাযে হাজির হওয়া জরুরি। জুমুআর নামাযে মহিলাদের ব্যবস্থা থাকলে তারা সপ্তাহে একদিন ইসলামের কিছু কথা শিখতে পারবে। সমাজের সবাই সবার সাথে মেলামেশা করলে একে অপরের সাথে আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নামায এ সুযোগই এনে দেয়।

২. যারা নিয়মিত নামাযে আসে তাদের কেউ যদি এক দিন না আসে তাহলে তার খোঁজ নেওয়া উচিত। হয়ত অসুখ হয়েছে। রোগীকে দেখতে যাওয়া ও তাকে সাহস দেওয়া সওয়াবের কাজ বলে রাসূল (স) বলেছেন। মসজিদে রোগীর জন্য দোআ করার নিয়ম চালু থাকা উচিত।

৩. রাসূল (স) বলেছেন, "যে পেট ভরে খায়, আর তার প্রতিবেশী ভুখা থাকে সে ঈমানদার নয়।" এর দ্বারা জানা গেল, প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর রাখা ঈমানী দায়িত্ব। গরীবদের সাহায্যের জন্য মসজিদ কমিটি একটা তহবিল

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে পারে। মসজিদ এলাকার সমাজে তা থেকে সাহায্য দিলে ঐ ঈমানী দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। কুরআনে বারবার "নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর" কথাটি একসাথে বলা হয়েছে। নামাযের সাথে যাকাতের কথা বলার মধ্যে ইশারা পাওয়া যায় যে, মসজিদ কমিটির ঐ তহবিলে যাকাতও নেওয়া যেতে পারে; যাতে গরীবদেরকে সাহায্য করা যায়।

৪. রাসূল (স) বলেছেন, "তোমরা যদি কাউকে কোনো মন্দ কাজ করতে দেখ, তাহলে ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে তা বন্ধ কর। এ ক্ষমতা না থাকলে মুখে বলে বুঝিয়ে ঐ কাজ থেকে তাকে ফেরাও। যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তাহলে মনে মনে ঐ কাজটিকে বন্ধ করার চিন্তা-ভাবনা কর। এটুকু করা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের প্রমাণ।"

সমাজে খারাপ কাজ অল্প লোকেই করে। কেউ বাধা না দিলে ঐ কাজ বাড়তে থাকে। সমাজকে মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করা সবারই ঈমানী দায়িত্ব। যারা মন্দ কাজ পছন্দ করে না, তারা মন্দ কাজের বিরুদ্ধে একজোট হলে তা সহজেই বন্ধ করা যায়।

মসজিদের ইমাম ও মসজিদ কমিটি মুসল্লীদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচাতে পারে।

৫. রাসূল (স) বলেছেন, "যারা বড়দের সম্মান করে না ও ছোটদের আদর করে না তারা আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।" সমাজের পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার জন্য এ অভ্যাস সবার মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে। যে বয়সে বড় তার সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলতে হবে ও তাকে আগে সালাম দিতে হবে। আর যে বয়সে ছোট তার সাথে স্নেহের ভাষায় কথা বলতে হবে। সামাজিক আদব-কায়দা সমাজের সবার মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৬. মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়ানোর বদ অভ্যাস সমাজকে কলুষিত করে। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করাকে কুরআনের ভাষায় 'গীবত' বলে। সূরা আল হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে গীবত বা পরনিন্দাকে মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঐ সূরার ১১ নং আয়াতে একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ও মন্দ নামে

www.pathagar.com

ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এসব অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এ জাতীয় লোককে এ থেকে বিরত করা জরুরি।

৭. যেকোনো কারণেই হোক, সমাজে ঝগড়া-বিবাদ হতেই পারে। সূরা হুজুরাতের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কঠোর হুকুম দিয়েছেন যে, বিবাদ দেখা দিলে এর মীমাংসা করতে হবে। বিবাদ বাড়তে দিলে দু'পক্ষে দু'দল জোটে যেতে পারে। মীমাংসা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, একপক্ষ বাড়াবাড়ি করছে, তাহলে জোর করে তাদেরকে থামিয়ে দিতে হবে। এতে বোঝা গেল, সমাজকে সংগঠিত অবস্থায় থাকতে হবে, যাতে বিবাদ লাগলে মীমাংসা করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন কারণে সমাজের কিছু লোককে অন্য সবাই মুরব্বি হিসেবে মানে। তারাই সমাজে বিচার-আচার করে। মসজিদ কমিটিও এ কাজটি করতে পারে। মুরব্বি ধরনের লোকেরা যদি মসজিদে নামাযে যায়, তাহলে তারাই তো কমিটির মধ্যে শামিল থাকবে।

গ্রামাঞ্চলে আজকাল ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত নেতারা বিচার-মীমাংসার দায়িত্ব পালন করেন। ঝগড়া-বিবাদই সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে। তাই ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার সুবন্দোবস্ত থাকা খুবই জরুরি। তাহলে আদালতে মামলা-মোকদ্দমা অনেক কমে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য যে ক'টি বিধি-বিধান উপরে তুলে ধরা হয়েছে, এসব যত মূল্যবানই হোক, এর কোনোটাই আপনা-আপনি সমাজে চালু হতে পারে না। এর জন্য যাদের দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য, তারা হলেন– মসজিদের ইমাম, মসজিদ কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি ও মেম্বারগণ, মুরব্বি হিসেবে যারা গণ্য এবং ইউনিয়নের নির্বাচিত নেতাগণ।

এসব দায়িত্বশীলের কারো না কারো গোপন সমর্থন ছাড়া সমাজবিরোধী কোনো মন্দ কাজ চালু থাকতে পারে না। তাই সমাজকে সুন্দর, শান্তিময় ও সুস্থ রাখতে হলে দায়িত্বশীলদের কেউ যাতে মন্দ কাজের পক্ষ হয়ে না যায়, সেদিকে অন্য দায়িত্বশীলদের কড়া নজর রাখতে হবে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হলে কেউ এর কুফল থেকে বাঁচতে পারবে না। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবন

রাজনীতি মানে রাজ্য বা রাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয়। একটা দেশের শাসন এমনিতেই চলে না। প্রত্যেক দেশেই গভর্নমেন্ট বা সরকার দেশ পরিচালনা করে। কীভাবে দেশ চলবে– এ ব্যাপারে যেসব বিষয়ে চর্চা করা হয়, সেসবকেই রাজনীতি বলা হয়। বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে জনগণ ভোটের মাধ্যমে যে দলকে ক্ষমতায় বসায়, সে দলই দেশটি শাসন করে।

রাজনৈতিক দলগুলো যা কিছু করে, সেসবকেই রাজনীতি বলা হয়। রাজনৈতিক দল ভালো হলে তাদের কাজে জনগণ খুশি হয়, আর খারাপ হলে তাদের কাজে বিরক্ত হয়। ভোটের সময় টের পাওয়া যায়, জনগণ কোন্ দলকে বেশি পছন্দ করে।

এককালে রাজা-বাদশাহরা দেশ শাসন করত। হয়তো 'রাজা' শব্দ থেকেই 'রাজনীতি' শব্দ গঠিত। তবে রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়, নীতির রাজাই হলো রাজনীতি। যেমন– রাজহাঁস মানে রাজার হাঁস নয়, হাঁসের রাজা।

নীতি মানে নিয়ম। দেশ কোন্ নিয়মে চলবে এর ফায়সালা করে রাজনীতি। এমনকি দেশে কোন্ কোন্ নীতি থাকবে আর কোন্ কোন্ নীতি থাকবে না, তা-ও রাজনীতিই সিদ্ধান্ত নেয়। তাই রাজনীতিই হলো নীতির রাজা। সকল নীতির উপরেই রাজনীতির অবস্থান।

মুসলিম জাতির রাজনীতি

যারা মুসলিম তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সকল বিষয়েই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম দিয়েছেন। রাসূল (স)-ই একমাত্র আদর্শ নেতা। তিনি যেভাবে রাজনীতি করেছেন সেভাবেই মুসলমানদের রাজনীতি করা কর্তব্য। রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ১০ বছর ঐ রাষ্ট্র শাসন করেছেন। তিনিই ইসলামী সরকারের প্রধান ছিলেন। তিনি রাসূল হিসেবে যে নীতিতে শাসন করেছেন, সে নীতিতে শাসন করাই মুসলিমজাতির জন্য ফরয। মুসলিমদেরকে সব কাজই আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী করতে হবে। তাই মুসলিম শাসকদের রাসূল (স)-এর নীতি অনুযায়ীই রাজনীতি করা কর্তব্য।

সূরা আন্ নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমজাতিকে যে নীতিতে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। ঐ আয়াতের

www.pathagar.com

অনুবাদ হলো :

"হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে, তাদেরকেও (মেনে চল)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ প্রতিফলের দিক দিয়েও এটাই ভালো।"

এ আয়াতটিতে মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল দিকের জন্যই বিধান দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য মোট ৬টি মূলনীতি পাওয়া যায় :

১. এ রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারকে সবসময় আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো রকম আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

২. রাসূল (স) যে নিয়মে শাসন করেছেন, সে নিয়মেই সরকারকে সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ব্যাপারেও কোনো আপত্তি করা চলবে না।

৩. সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের উপর যেসব হুকুম জারি হয়, তা-ও সবাইকে মানতে হবে। তবে আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে আপত্তি করার অধিকার না থাকলেও সরকারের হুকুমের ব্যাপারে জনগণের আপত্তি করার অধিকার আছে।

৪. কেউ যদি সরকারের কোনো হুকুমকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকাবিরোধী মনে করে, তাহলে নির্দিষ্ট বিশেষ আদালতে আপত্তি জানাতে পারবে। আদালত উভয় পক্ষের কথা শুনে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী যে রায় দেবে তা সবাইকে মেনে নিতে হবে।

নামাযে যেমন ইমাম সাহেবের কোনো ভুল হলে মুক্তাদীকে ভুল সংশোধনের জন্য আল্লাহু আকবার বা সুবহানাল্লাহ বলে আপত্তি জানাতে হয় (একে লুকমা দেওয়া বলা হয়), তেমনি সরকারের কোনো ভুল দেখলেও আদালতে আপত্তি জানাতে হবে।

আমরা যে ইমামের পেছনে নামায আদায় করি, তিনি আসল ইমাম নন। আসল ইমাম রাসূল (স)। তিনি যে নিয়মে নামায আদায় করেছেন, সব ইমামকে ঠিক ঐভাবেই নামায আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম ভুল করলে ইমামকে সংশোধন করতে হবে। তেমনি ইসলামী-রাষ্ট্রের সরকারকে রাসূল (স)-এর নিয়মেই দেশ শাসন করতে হবে। কারণ, আসল শাসক রাসূল (স)-ই।

www.pathagar.com

নামাযে ইমাম ভুল করলে তাকে ধমক দিয়ে বা রাগ দেখিয়ে বা গালমন্দ বলে সংশোধন করার শিক্ষা রাসূল (স) দেননি। অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য নিয়ম শেখানো হয়েছে। তেমনিভাবে সরকার ভুল করলে সভ্য ভাষায় আদালতকে জানাতে হবে। জনগণকে জানানোও দূষণীয় নয়। কুরআন ও হাদীসের যুক্তি দেখিয়ে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। অভদ্র ভাষায় আপত্তি জানানোর দরকার কী? গাল-মন্দই বা করতে হবে কেন?

৫. ঐ আয়াত থেকে আরো জানা গেল, সরকারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর জন্য এমন আদালত থাকতে হবে, যা সরকারের অধীন নয়। সরকারের অধীন আদালত সরকারের মতের বিরুদ্ধে রায় দিতে সাহস করবে না। এতে প্রমাণ হলো যে, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন রাখার বিধান কুরআনই দিয়েছে।

৬. ঐ আয়াত থেকে এ বিধানও পাওয়া যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শাসক মুসলমানদের মধ্য থেকেই হতে হবে। মুমিনদেরকে ডেকে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে, তাদেরকেও মেনে চল"। ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শাসন করতে হয়, সেহেতু কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী ও জ্ঞানী লোকদের উপরই এ দায়িত্ব দিতে হবে। যেকোনো সাধারণ মুসলমান এ দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব দায়িত্ব পালনে কুরআন-হাদীসে জ্ঞানী হওয়া জরুরি নয়, সেসব বড় পদে অমুসলিম নাগরিকদেরকেও নিয়োগ করা যায়।

ইসলামী সরকারের ৪ দফা কর্মসূচি

আল্লাহ তাআলা সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতে মুসলিম শাসকদেরকে ৪ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন। এ কর্মসূচি যে সরকার ঠিকমতো পালন করে, সে সরকারই আল্লাহ তাআলার নিকট ইসলামী সরকার হিসেবে গণ্য। আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

"তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি দুনিয়াতে ক্ষমতায় বসাই, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত চালু করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের শেষফল আল্লাহরই হাতে।"

১. ইসলামী সরকারের পয়লা কাজ হলো, দেশে নামায কায়েম করা। এর আগে নামাযের আলোচনায় সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে ও সূরা তোয়াহার ১৪ নং আয়াতে নামাযের যে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তাতে বোঝা গেল, নামায চরিত্রকে উন্নত বানায়। এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জনগণের চরিত্র গঠন করাই ইসলামী

www.pathagar.com

সরকারের পয়লা দায়িত্ব। সরকারের পয়লা কাজই হলো মানুষকে ভালো ও নেককার বানানো।

সরকারিভাবে নামায কায়েমের দায়িত্ব পালন করলে–

ক. সকল সরকারি অফিসে নিয়মিত জামাআতে নামাযের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জামাআতে শরীক হতে হবে।

খ. সরকারি হুকুমের ফলে দেশে সকল প্রতিষ্ঠানে জামাআতে নামাযের সুব্যবস্থা থাকবে।

গ. জামাআতে নামায আদায় করার জন্য সব স্থানে মসজিদ তৈরি হবে।

ঘ. ছোট বয়স থেকে সকল মুসলিম ছেলেমেয়েকে শুদ্ধভাবে নামায শেখানোর সুব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. নামায যে শুধু একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয় এবং নামাযের উদ্দেশ্য যে উন্নত চরিত্র গঠন করা, সে বিষয়ে সবাই সচেতন হবে।

চ. এমন পরিবেশ গড়ে উঠবে, সবাই নিয়মিত জামাআতে হাজির হওয়ার জন্য তৎপর হবে।

ছ. মুসলমানদের উন্নত চরিত্র দেখে অমুসলিমরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কারণ, সকল মানুষই উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করে।

চরিত্রের গুরুত্ব

মানুষের আসল পরিচয়ই হলো নৈতিক জীব। যে বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে না, সে-ই ভালো মানুষ। যে সমাজে ভালো মানুষের সংখ্যা যত বেশি, সেখানে অশান্তি তত কম। যদি সমাজে চুরি-ডাকাতি না থাকে, কেউ কাউকে ঠকাতে চেষ্টা না করে, কেউ কারো ক্ষতি না করে, তাহলে সেখানে সবাই শান্তিতে থাকবে।

সরকারের প্রথম দায়িত্ব হলো, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করা। দেশের মানুষ যদি চরিত্রবান হয় তাহলে সরকারের এ দায়িত্ব পালন সবচেয়ে সহজ হয়। এজন্য ইসলামী সরকারের এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো জনগণের চরিত্র গঠন করা। তাই নামায কায়েম করা ইসলামী সরকারের ৪ দফা কর্মসূচির পয়লা দফা।

২. ইসলামী সরকারের দ্বিতীয় দফার কাজ হলো, যাকাতব্যবস্থা চালু করা। মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ার আগে যাকাতের হুকুমই আসেনি। কারণ, যাকাতের যে উদ্দেশ্য, তা ইসলামী সরকার ছাড়া পূরণ হতে পারে না। রাসূল (স) ও প্রথম চার খলীফা যাকাতব্যবস্থা চালু করে দেশের সব মানুষের

www.pathagar.com

অভাব দূর করেছেন। কোনো না কোনো কারণে যাদের ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির খরচ যোগাড় করা সম্ভব হয় না, তাদের এ অভাব দূর করার দায়িত্ব সরকারের। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই যাকাত ফরয করা হয়েছে। যাদের উপর যাকাত ফরয, তাদের কাছ থেকে সরকার যাকাত উসুল করবে এবং যাদের যাকাত পাওয়ার হক রয়েছে, তাদের কাছে যাকাতের টাকা পৌঁছিয়ে দেবে। তাহলে দেশে কেউ ভাত, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না।

৩. ইসলামী সরকারের তৃতীয় দফার কাজ হলো, জনগণকে ভালো কাজ করার হুকুম দিতে থাকা। যারা ওয়াজ করেন, তারা জনগণকে ভালো কাজ করার উপদেশ দিতে পারেন; কিন্তু ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিতে পারেন না। সরকার যদি দেশের মানুষকে ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয় এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়, তাহলে সহজেই তা চালু হতে পারে। যেসব কাজ মানুষের জন্য উপকারী ও যা করলে জনগণের সুখ-শান্তি বাড়ে সেসব কাজ দেশে চালু করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তাহলে জনগণ উৎসাহের সাথে ঐসব কাজে শরীক হবে।

জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, স্বাস্থ্যসেবার জন্য স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা করা, যাতায়াতব্যবস্থা সহজ ও উন্নত করা, সকলকে এমন সব কাজ শেখার সুযোগ দান করা, যাতে সবাই আয়-রোজগার করতে পারে এবং কাউকেই বেকার থাকতে না হয়। এমন সব কাজ, যা যুবকদের চরিত্র উন্নত করাতে সহায়ক হয় ইত্যাদি।

৪. ইসলামী সরকারের চতুর্থ দফার কাজ হলো, সব রকম মন্দ কাজ বন্ধ করা। যেসব কাজ নৈতিকতাবিরোধী, যা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে, যা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, যা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে— এ জাতীয় কোনো কাজ যাতে দেশে চালু হতে না পারে, সেদিকে সরকারকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। কোথাও এ ধরনের কোনো কাজ হচ্ছে বলে জানার সাথে সাথে তা বন্ধ করতে হবে।

যারা ওয়াজ করেন তারা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু মন্দ কাজ বন্ধ করা বা যারা করে তাদেরকে নিষেধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ কাজ সরকারকেই পালন করতে হবে।

কতক লোক এমনও আছে, যারা ধর্মের নামে এমন কিছু রসম-রেওয়াজ চালু করে, যা শরীআতের বিচারে শির্ক ও বিদআত হিসেবে গণ্য এবং কুরআন-হাদীসে এসবের পক্ষে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই; বরং এসব

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসবিরোধী। ধর্মীয় ব্যবসা হিসেবেই এসব চালু থাকে। এ সবের মাধ্যমে কতক লোক জনগণ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়। হকপন্থি আলেমগণ এসবের বিরুদ্ধে যত ওয়াজ-নসীহতই করেন, তাতে এসব বন্ধ হয় না। কারণ, আলেম নামধারী ধর্ম-ব্যবসায়ীরাই অশিক্ষিত জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ঐসব কাজে শরীক করে। এসব মন্দ কাজ ইসলামী সরকার ছাড়া কারো পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব নয়। রাসূলের জন্মভূমি সৌদি আরবে পর্যন্ত এ জাতীয় অনেক শির্ক ও বিদআতী কাজ চালু ছিল। বাদশাহ আবদুল আযীয আল সউদের সরকার ঐসব থেকে দেশকে পবিত্র করেন। মদীনার 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে বড় বড় সাহাবীগণের কবর পাকা করে মাজার-পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সৌদি সরকার সেসব ভেঙে রাসূল (স)-এর হুকুম চালু করেন।

বর্তমান যুগে বিশ্বের সরকারগুলোর অবস্থা

মাত্র অল্প কয়েকটি মুসলিম দেশ ছাড়া দুনিয়ার সব দেশেই, এমনকি মুসলিম দেশেও সরকারিভাবে পবিত্র কুরআনে দেওয়া ঐ ৪ দফার কোনো দফার কাজ চালু নেই; বরং সরকারি সাহায্যেই বহু মন্দ কাজ সব দেশে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সরকারি টেলিভিশনেও চরিত্র ধ্বংসকারী বেহায়াপনা বেড়েই চলছে। তাই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা কমার কোনো কারণ নেই।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যোগ্য লোক তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে সৎলোক হিসেবে গড়ে তোলার কোনো ব্যবস্থা নেই। সততা তো এমনিতেই পয়দা হতে পারে না। এর জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয়। যেমন– বিনা চেষ্টায় বাগান তৈরি হয় না। জঙ্গল আপনা-আপনিই গজাতে পারে।

যোগ্যতার সাথে যদি সততা শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে যোগ্য অসৎ লোকই তৈরি হতে থাকবে। যোগ্য লোক যদি অসৎ হয়, তাহলে সে যোগ্যতার সাথেই অসৎ কাজ করবে। বাস্তবে এটাই হচ্ছে। আমাদের দেশ অশিক্ষিত লোকেরা চালাচ্ছে না। শিক্ষিত যোগ্য লোকেরাই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছে। দুর্নীতিতে সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশ ১৯৯৯ সাল থেকেই এক নম্বর আসন দখল করে আছে। এর জন্য কি অশিক্ষিতরা দায়ী?

তাই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চাইলে চরিত্রবান জাতি হিসেবে জনগণকে গড়ে তুলতে হবে। আর এটা সরকারকেই করতে হবে। ইসলামী সরকার কায়েম না হলে এবং কুরআনে ঘোষিত ৪ দফা অনুযায়ী দেশকে গড়ে না তুললে জনগণ সুখ-শান্তির মুখ কোনো দিন দেখতে পাবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ১০টি মূলনীতি

রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, এর ১০টি মূলনীতির ৬টি সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত থেকে পাওয়া। এ ৬টির আলোচনা আগেই করেছি। এখানে ঐ ৬টিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করে বাকি ৪টি একসাথে পেশ করছি :

১. আল্লাহর প্রভুত্ব বা সাবভৌমত্ব– আইন রচনার আসল ক্ষমতা আল্লাহর। আল্লাহর আইনের অধীনেই অন্য সব আইন তৈরি করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন রচনা করা চলবে না।

২. রাসূল (স)-এর নেতৃত্ব– যারাই সরকারি ক্ষমতায় থাকুন, তাদেরকে রাসূল (স) যেভাবে শাসন করেছেন সেভাবে শাসন করতে হবে।

৩. ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন– সরকারি ক্ষমতা এমন লোকদের হাতে থাকা দরকার, যারা রাসূল (স) ও চার খলীফার আদর্শ ও নীতি মেনে চলার যোগ্য এবং মেনে চলতে সচেষ্ট।

৪. সরকারের ভুল ধরার অধিকার– সরকার আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূল (স)-এর নেতৃত্ব ঠিকমতো মেনে চলছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব সবার। প্রয়োজন হলে আপত্তি করার অধিকার জনগণের আছে বলে সরকারকে স্বীকার করতে হবে।

৫. স্বাধীন আদালত– সরকারের বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রায় দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের হাতে থাকতে হবে।

৬. সরকারকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে।

৭. সরকারের মনগড়া হুকুম জারি করার কোনো অধিকার নেই। কুরআন ও সুন্নাহকে সকল হুকুমের মূল ভিত্তি মনে করতে হবে। এমন কোনো হুকুম জারি করা চলবে না, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী।

৮. আইনের শাসন কায়েম করতে হবে– শাসকদের মনগড়া শাসন নয়, তাদের প্রতিটি কাজ আইন মোতাবেক হতে হবে। আইনের চোখে সব নাগরিক সমান। মুসলিম ও অমুসলিম, শাসক ও জনগণ সবাই একই আইনের অধীন। আইনের নাগালের বাইরে কেউ নয়।

৯. মৌলিক-মানবিক অধিকার থেকে কোনো নাগরিক বঞ্চিত থাকবে না। জান ও মালের নিরাপত্তা, ইজ্জতের নিরাপত্তা, ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষালাভের অধিকার সকল নাগরিকেরই রয়েছে। মানুষ হিসেবে সম্মানের সাথে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

১০. আদালতে আইনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা চলবে না। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কারো সাথে অপরাধীর মতো আচরণ করা যাবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল

ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল থাকা দূষণীয় নয়। তবে সকল রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য একই হতে হবে। দেশকে সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। জনগণ ভোটের মাধ্যমে যে দলকে ক্ষমতায় বসায়, সে দলই শাসন করবে। সরকারের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে যেকোনো দল চেষ্টা করতে পারে। এটাও পবিত্র দায়িত্ব। তবে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবে।

নামাযে ইমামকে সংশোধন করার জন্য যে ভদ্র ও সভ্য নিয়ম রয়েছে, সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও সে নীতি চালু থাকা জরুরি। বিরোধীদলীয় রাজনীতির নামে যে নোংরামি, অসভ্যতা ও জঘন্য তৎপরতা দেখা যায়— এ জাতীয় রাজনীতি ইসলামী রাষ্ট্রে থাকার কথা নয়।

ইসলামী সরকারকে নির্বাচিত হতে হবে

রাসূল (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে কাউকে তাঁর খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেননি। হযরত আবু বকর (রা), ওমর (রা), ওসমান (রা) ও আলী (রা) নিজেরা চেষ্টা করে খলীফা হননি। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁরা নির্বাচিত ছিলেন।

বর্তমানে নির্বাচনের যে চমৎকার নিয়ম দুনিয়ায় চালু হয়েছে, ঠিক এ নিয়মে না হলেও তাঁরা অবশ্যই নির্বাচিত হয়েই খলীফার আসন গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁরা কেউ অনির্বাচিত শাসক ছিলেন না। তাঁদের কেউ শক্তিবলে ক্ষমতা দখল করেননি। তাঁদের সবাই বাছাই করা সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে সরকারি দায়িত্ব পালন করতেন।

মজলিসে শূরা

আল্লাহর নিকট থেকে রাসূল (স) যে ওহী পেতেন, সে অনুযায়ীই সরকারি দায়িত্ব পালন করতেন। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে তাঁকে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দিয়েছেন। যেসব

www.pathagar.com

ব্যাপার ওহীর মাধ্যমে কোনো আদেশ পেতেন না, সেসব বিষয়ে রাসূল (স) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন।

পরামর্শ শব্দের আরবী হলো 'শূরা'। যাদের সাথে পরামর্শ করতেন তাদেরকেই একসাথে মজলিসে শূরা বলা হয়। আধুনিক ভাষায় আইন সভা বা আইনপরিষদ বলা যায়। ইংরেজিতে পার্লামেন্ট বলা হয়। বাংলাদেশে 'জাতীয় সংসদ' বলে। এর মেম্বারগণকে এমপি বলা হয়। এমপিগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত।

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত মজলিসে শূরা প্রয়োজন। এর সদস্যগণ জনগণের পক্ষ থেকে সরকারি দায়িত্ব পালন করবেন।

সরকার কাঠামো

সরকারের আকার বা কাঠামো যে রকমই হোক, যদি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ১০টি নীতি চালু থাকে তাহলে ঐ সরকারকে ইসলামী সরকার বলা যায়।

দুনিয়ায় এ পর্যন্ত কয়েকটি আকার বা কাঠামোর সরকার চালু হয়েছে :

১. রাজতন্ত্র বা বংশগত বাদশাহী। কোনো এক বংশের লোক দেশের ক্ষমতায় বসল। ঐ বংশের নেতা রাজা বা বাদশাহ হিসেবে দেশ শাসন করল। এরপর ঐ বংশেরই রাজত্ব অনেক দিন চলল। এখনও (২০০৬ সাল) এ জাতীয় সরকার কতক দেশে চালু আছে।

   রাসূল (স) ও প্রথম চার খলীফা এ জাতীয় সরকার কাঠামো চালু করেননি। অথচ ইসলামী সরকারের আদর্শ তাঁরাই। তাই রাজতন্ত্র ইসলামী সরকারের সঠিক কাঠামো হতে পারে না।

২. সামরিক সরকার। সেনাবাহিনী সবচেয়ে বেশি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত। বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে হেফাজত করার জন্য তাদের হাতেই যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম থাকে। তাই তারা যদি দেশ শাসনের ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাহলে সহজেই সরকারি ক্ষমতায় বসতে পারে। ইসলামী সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত, দেশ-শাসনের জন্য নির্বাচিত নয়। তাই এটাও ইসলামী সরকারের জন্য উপযোগী নয়।

৩. গণতান্ত্রিক সরকার। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই গণতান্ত্রিক। বর্তমানে দু'ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার দুনিয়ায় চালু আছে।

   ক. প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার (Presidential Form of Govt.)। এ সরকার কাঠামোতে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (আমেরিকা) ছাড়া এ জাতীয় সরকার কোনো দেশে গণতান্ত্রিক মানে চালু নেই। যেখানেই এ কাঠামো চালু হয়েছে, সেখানেই এক ব্যক্তির শাসন বা একনায়কত্ব কায়েম হয়েছে। তাই এ জাতীয় কাঠামোও ইসলামী সরকারের জন্য সঠিক নয়।

খ. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (Parliamentary Form of Govt.)। এ পদ্ধতি সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে চালু হয় এবং বর্তমানে যত দেশে মোটামুটি গণতান্ত্রিক সরকার চালু আছে, সবক'টি দেশেই এ পদ্ধতির সরকার কায়েম আছে। বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল থেকে এ পদ্ধতির সরকারই চলছে। এতে নির্বাচিত সংসদ (পার্লামেন্ট) দেশ শাসন করে। সংসদে যে দলের এমপি'র সংখ্যা বেশি, সে দল থেকেই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীই সরকারপ্রধান। এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আরেকজনের হাতে থাকে। এ কাঠামো অনুযায়ী ইসলামী সরকার চলতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার স্বাধীন ইখতিয়ার দিয়েছেন। মানুষকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা নবীকেও দেওয়া হয়নি। ঈমান আনা মনের ব্যাপার। মনের উপর জোর চলে না। তাই জোর করে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করতে আল্লাহ নিজেই নিষেধ করেছেন।

রাসূল (স) ও চার আদর্শ খলীফার শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমও ছিল। তাদের ব্যাপারে যে নীতি তখন চালু ছিল তা খুবই ইনসাফপূর্ণ। সেসব হলো :

১. তারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদেরকে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার নেই।

২. নাগরিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

৩. আদালতে বিচারের বেলায় একই আইন সবার উপর সমানভাবে চালু থাকবে।

৪. বিবাহ, তালাক, সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে কোনো ধর্মের লোক যদি তাদের ধর্মের নিয়ম পালন করতে চায়, তাহলে তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচন পদ্ধতি

কোন্ নিয়মে নির্বাচন হতে হবে– এ বিষয়ে ইসলাম নির্দিষ্ট কোনো বিধান চাপিয়ে দেয়নি। প্রথম ও চতুর্থ খলীফা একই নিয়মে নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফা আরও দু'রকম নিয়মে নির্বাচিত হয়েছেন। এতে বোঝা গেল, কোনো বিশেষ নিয়মেই নির্বাচন হতে হবে– এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই; তবে অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে।

নির্বাচনের উদ্দেশ্য এটাই যে, জনগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের রায় জানানোর সুযোগ পায়। জোর করে ব্যালট-বাক্স দখল করে নিলে, জাল ভোট দিলে, ভোট গণনার সময় কারচুপি করলে নির্বাচনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যাতে জনগণের স্বাধীন মত অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পায়, সে ব্যবস্থা করার জন্য যা করা জরুরি তা হলো :

১. ভোটারদের তালিকা সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে।

২. জালভোট বন্ধ করার জন্য ফটোসহ প্রত্যেক ভোটারের পরিচয়পত্রের (আইডেনটিটি কার্ড) ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য যে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়, সে কমিশনকে সরকারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে।

৪. যে রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করে, নির্বাচনের সময় ঐ দলীয় সরকার বহাল থাকলে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় না বলে বাংলাদেশে একটা নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। একে 'কেয়ার-টেকার সরকার' (Care Taker Govt.) বলা হয়। ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ার-টেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় মোটামুটি ভালো হয়েছে; কিন্তু নির্বাচনে টাকার খেলা চলার কারণে নির্বাচন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়নি।

৫. ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে বিশেষ করে জার্মানি ও তুরস্কের মতো বড় দেশে এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে, যা টাকার খেলা বন্ধ করতে পারে। ঐ নিয়মে কোনো প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে ভোট না দিয়ে দলকে ভোট দেওয়া হয়। ভোট গণনার পর যে দল যত ভোট পায়, সে অনুপাতে সংসদে আসন পায়। ব্যক্তিগতভাবে কোনো প্রার্থীর কোনো এলাকা নির্দিষ্ট থাকে না। তাই কোনো প্রার্থী এলাকায় টাকার জোরে বেশি ভোট যোগাড়ের চেষ্টা করে না। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি চালু হলে নির্বাচন আরও সুষ্ঠু হবে। এ পদ্ধতির নাম 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' (Proportional Representation)।

www.pathagar.com

ইসলামে ভোটের গুরুত্ব

ভোট (VOTE) ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ হলো রায় দেওয়া, সমর্থন করা, মত প্রকাশ করা, সম্মতি দান করা।

আমরা অনেক জায়গায়ই ভোট দেই। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্কুল-মাদরাসা, ক্লাব-সমিতি প্রভৃতির কমিটি নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভোট হলো জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট দেওয়া।

ভোট দেওয়ার মানে কী? যে ভোট দেয় তার কী দায়িত্ব? যাকে ভোট দেওয়া হয় তার দায়িত্বই বা কী? যাকে ভোট দেওয়া হয় তার ভালো ও মন্দ কাজের জন্য কি ভোটদাতা দায়ী হবে? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি :

কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি ইউনিয়নের এলাকা ধরা হয়। ইউনিয়নের জনগণের সেবা করার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের একজন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন মেম্বার থাকেন। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে যাদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর তারা ভোটার হয়। চেয়ারম্যান ও মেম্বার কারা হবে, তা নির্বাচনের মাধ্যমে ফায়সালা করা হয়। যারা বেশি ভোট পায়, তারা ইউনিয়নের নেতা হিসেবে গণ্য হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের দায়িত্ব কী– ইউনিয়নের জনগণ যাতে আরামে চলাফেরা করতে পারে, সেজন্য রাস্তা বানাবে; বৃষ্টির পানি যাতে খালে-বিলে চলে যায় এবং পানি জমে গিয়ে জনগণের চলাফেরায় যাতে অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা করবে। ইউনিয়নে যাতে চুরি-ডাকাতি না হয় সেজন্য চৌকিদার দিয়ে পাহারা দেওয়াবে। ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এবং ঝগড়া লাগলে আপস করিয়ে দেবে। এভাবে অনেক রকমের কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে।

ইউনিয়ন কাউন্সিলকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। এর অর্থ হলো ইউনিয়নের এলাকায় ইউনিয়ন কাউন্সিলই জাতীয় সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের সেবা করবে, যাতে সবাই সুখে-শান্তিতে ও মিলে-মিশে বসবাস করতে পারে।

গ্রামের স্থানীয় সরকারকে ইউনিয়ন কাউন্সিল বলে। শহরের স্থানীয় সরকারকে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা বলে। জেলা-শহর, উপজেলা-শহর এমনকি বড় কোনো বাজারেও পৌরসভা থাকে। বিভাগীয় শহরের স্থানীয় সরকারকে

www.pathagar.com

কর্পোরেশন বলে। যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল। সকল স্থানীয় সরকারই সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়।

নির্বাচনে যারা ভোট পাওয়ার জন্য দাঁড়ায় তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে, যাকে জনগণ ভালো লোক মনে করে না; কিন্তু তার ধনবল ও জনবল থাকায় বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে যায়। কোনো অসৎ লোক যদি চেয়ারম্যান ও মেম্বার হয় তাহলে ক্ষমতা হাতে পেয়ে জনগণের সেবা করার বদলে নিজের স্বার্থ হাসিল করে। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার যে টাকা-পয়সা দেয় তা থেকে অসৎ লোকটি টাকা মেরে দেয়। নির্বাচনের সময় যে টাকা সে খরচ করেছে, এরচেয়ে বেশি টাকা দুর্নীতি করে কামাই করে নেয়। ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঘুষ খেয়ে অবিচার করে। ক্ষমতার দাপটে কারো কারো উপর যুলুমও করতে পারে।

তাই ভোটদাতাদেরকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে- যাতে সৎ, চরিত্রবান ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হয় এবং কোনো অসৎ লোক পাস করতে না পারে। যদি কোনো অসৎ লোক নির্বাচিত হয় তাহলে সে যত গুনাহের কাজ করবে আখিরাতে এর সমান শাস্তি তারাও ভোগ করবে, যাদের ভোটে সে পাস করেছে। আর যদি সৎ লোক পাস করে তাহলে সে যত ভালো কাজ করবে, এর সমান সওয়াব তারাও পাবে, যারা তাকে ভোট দিয়েছে।

তাহলে দেখা গেল, নির্বাচনে ভোট দেওয়াটা খেল-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা এক বিরাট পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলে জনগণ সেবা পেয়ে দুনিয়ায় সুখ পাবে এবং ভোটদাতারা আখিরাতে পুরস্কার পাবে। এ কারণেই ইসলামী শরীআতে ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট দায়িত্বপূর্ণ বিষয়।

এখন ভেবে দেখুন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব কত বেশি। যারা এমপি নির্বাচিত হন তারা সৎ হলে গোটা জাতি তার খিদমত পেয়ে সুখী হবে এবং ভোটদাতারা সওয়াব পাবে। আর যদি অসৎ লোক এমপি হয়ে মন্ত্রী হয় তাহলে সে জনগণ ও দেশের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। যাদের ভোটে এমন লোক পাস করবে, তাদের দশা আখিরাতে কী হতে পারে, তা হিসাব করে দেখুন।

তাই ভোট এক বিরাট আমানত। সৎ লোককে ভোট না দিলে এ মহান আমানত রক্ষা করা যাবে না। ভোট একটি মূল্যবান অধিকার। এর হেফাযত করতে হলে সৎ লোককে ভোট দিতে হবে। ভোট একটি নৈতিক দায়িত্ব। অসৎ লোককে ভোট দিলে এ দায়িত্বে অবহেলার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে পেতে হবে। ভোট

www.pathagar.com

একটি বড় ক্ষমতা। কয়েকটি ভোট বেশি পেয়েও কেউ নির্বাচনে জিতে যায়। এ ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার, যাতে আল্লাহ খুশি হন।

যদি আপনারা চান, বাংলাদেশে কুরআনের আইন চালু হোক এবং রাসূল (স) যেভাবে দেশ শাসন করেছেন সে রকমের শাসন কায়েম হোক তাহলে এমন সব দলকেই ভোট দিতে হবে, যারা আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করে বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। দেশের সরকার কায়েমের বিরাট ক্ষমতাটুকু জনগণেরই হাতে। তাদের ভোটেই দুর্নীতিবাজ সরকার কায়েম হয়। তাদের ভোটেই ইসলামী সরকারও কায়েম হওয়া সম্ভব। এসব কথা বিবেচনা করলে ভোট যে ইসলামের দৃষ্টিতে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই বোঝা যায়। যদি কেউ দুনিয়ার স্বার্থে বা টাকা-পয়সার বিনিময়ে কোনো অসৎ লোককে ভোট দেয় তাহলে কবিরা গুনাহ হবে; আর যদি কেউ আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কোনো সৎ লোককে ভোট দেয় তাহলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

অর্থনৈতিক জীবন

অর্থ মানে টাকা-পয়সা। দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যত জিনিসপত্র দরকার সবই যোগাড় করতে টাকা-পয়সা জরুরি। তাই সব জিনিসের দাম টাকার হিসাবেই ঠিক করতে হয়।

বাঁচতে হলে খেতে হবে। খেতে হলে খাবার জিনিস যোগাড় করতে হবে। খাবার জিনিস তৈরি না হলে যোগাড় করা যায় না। জিনিস তৈরি করাকে উৎপাদন বলে। ইংরেজিতে Production বলে। জিনিস উৎপন্ন হলে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সব জরুরি জিনিস সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। এটাকে বণ্টন (Distribution) বলে।

মানুষের যত রকম জিনিস দরকার, এর উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে যা কিছু করতে হয় এবং যেসব নিয়ম চালু করতে হয়, সেসবকেই অর্থনীতি বলা হয়। এ অর্থনীতি মানুষের জীবনের বিশাল এলাকা দখল করে আছে। মানুষ অর্থনীতির বিধি-বিধানের অধীন। তাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপক এবং কোনো মানুষ এর বাঁধন থেকে মুক্ত নয়। সব মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার।

দেশের সরকারই অর্থনৈতিক বিধি-বিধান তৈরি ও জারি করে। সরকার যদি দেশের সকল মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে চায়, তাহলে এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে ধরনের বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন দরকার, তা-ই তৈরি

www.pathagar.com

ও জারি করবে। কিন্তু দেখা যায় যে, দেশের অল্প কিছু লোক সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং বিলাসিতা করে বিরাট অংকের টাকা উড়িয়ে দেয়। আর বেশিরভাগ লোকই কোনো রকমে বেঁচে থাকে। কিন্তু এমন অনেক লোকও থাকে, যারা ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা ইত্যাদির অভাবে কষ্ট পায়। এ অবস্থার জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দায়ী। যে নীতিতে সরকার দেশ শাসন করে এবং সে নীতি দেশে যে রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে, জনগণ সে রকম সুবিধা বা অসুবিধাই ভোগ করে।

আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

দেশে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চালু থাকা জরুরি যাতে–

১. দেশের মানুষ ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

২. কোনো মানুষ যাতে মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন (ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা) থেকে বঞ্চিত না থাকে।

৩. কোনো মানুষকে যাতে অন্য কোনো মানুষের অর্থনৈতিকভাবে গোলাম হতে বাধ্য হতে না হয়।

৪. দেশের ধন-সম্পদ যাতে অল্প কিছু লোকের মালিকানায় চলে না যায়।

৫. সবাই যাতে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী আয়-রোজগার করার সুযোগ পায় এবং কোনো কারণে যারা আয় করার যোগ্য নয়, তারাও যেন অভাবে কষ্ট না পায়।

এ পাঁচটি অর্থনৈতিক মহৎ উদ্দেশ্য যে খুবই যুক্তিপূর্ণ, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সব দেশের সরকারই দাবি করে যে, তারা এ উদ্দেশ্যেই অবিরাম চেষ্টা করছেন। তাহলে বাস্তবে এ ব্যবস্থা চালু নেই কেন? এ উদ্দেশ্য ক'টি যে মহৎ ও চমৎকার তা স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তবে তা সফল হচ্ছে না কেন?

এসব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

এ মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আসল কারণ :

১. মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এত সামান্য যে, সবদিক দিয়ে সঠিক ও নির্ভুল কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাধ্য মানুষের নেই। তাই ভুল থেকে বাঁচার জন্য নতুন ব্যবস্থা তৈরি করতে বাধ্য হয়। তবুও ভুলই হতে থাকে।

২. মানবজাতির অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে যেসব নীতিমালা দান করেছেন, তা মানুষ মেনে চলে

www.pathagar.com

না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে মানুষ আল্লাহর দেওয়া নীতি অমান্য করে। জাতীয় স্বার্থেও এক জাতি অন্য জাতির প্রতি যুলুম করে।

৩. স্বার্থে অন্ধ হয়ে মানুষ অর্থনৈতিক ময়দানেই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করে। আল্লাহ তাআলা যেসব পথকে হারাম করেছেন, মানুষের বিবেক তা সঠিক মনে করলেও অন্যায়ভাবে স্বার্থ হাসিলের জন্য হারাম পথেই চলে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণার হাজারো উপায় মানুষ বের করে নেয়। সবাই সবাইকে ঠকিয়ে ধনী হতে চায়। তাই সবাইকেই ঠকের শিকার হতে হয়। যে ঘুষ খায় তাকেও বহু জায়গায় ঘুষ দিতে হয়।

৪. এর আসল কারণ একটাই। তা হলো, আল্লাহর বিধান না মানা। যা মেনে চললে সকল মানুষ সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে, সে বিধানই আল্লাহ দান করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর বিধান মযবুতভাবে চালু আছে। মানবসমাজকে আল্লাহ তাঁর বিধান মেনে চলতে বাধ্য করেননি। তাই মানুষ মনগড়া ভুল বিধান মেনে চলেই অশান্তি ভোগ করছে।

প্রাণিজগতের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান

কুরআন মাজীদের ১২ নং পারার ১ম আয়াতে (সূরা হূদের ৬নং আয়াত) আল্লাহ বলেন, "দুনিয়ায় এমন জীব নেই, যার রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই।"

'রিয্‌ক' শব্দটি কুরআনে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এর মর্ম ব্যাপক। কোনো জীবের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব জিনিসের দরকার, সেসবই ঐ জীবের রিয্‌ক। গাছেরও প্রাণ আছে। রিয্‌কের অভাবে গাছ মরে যায়। বেঁচে থাকার জন্য গাছের যা কিছু জরুরি তা সবই গাছের জন্য রিয্‌ক। তাহলে রিয্‌ক মানে জীবনের উপকরণ।

উপরের আয়াতে আল্লাহ দাবি করেছেন, দুনিয়ার সব জীব বা প্রাণীর রিয্‌কের বন্দোবস্ত করার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। মানুষ ছাড়া কোনো প্রাণীই রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পায় না। অন্যান্য প্রাণী মরে, কিন্তু রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পেয়ে মরে না।

এ দাবি যে মহাসত্য, সে কথা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। বন-জঙ্গলে যত পশু-পাখি আছে, এর কোনো একটাকেও রিয্‌কের অভাবে শুকিয়ে যেতে দেখা যায় না। মানুষ যেসব জীব পোষে (যেমন– গরু, ছাগল ইত্যাদি) এর মধ্যে হাড্ডিসার অবস্থাও দেখা যায়; কিন্তু বনে কোনো পশুকে এমন অবস্থায় দেখা যায় না।

www.pathagar.com

ছোট-বড় যেসব পাখি আমরা আশপাশে উড়তে দেখি, এর কোনোটাকে ধরে প্রমাণ করা যাবে না যে, ওটা না খেয়ে শুকিয়ে গেছে। আমাদের ঘরের মুরগি শুকনা হতে পারে। কারণ, এর রিয্কের দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি। এর দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়।

পশু-পাখিদের মধ্যে কোনো সরকার কায়েম নেই; কিন্তু তাদের উপর আল্লাহর রাজত্ব কায়েম আছে। তিনি তাদের সবার রিয্কের ব্যবস্থা করছেন। ছোট্ট কোনো কীট বা কোনো পিঁপড়াও রিয্কের অভাবে কষ্ট পায় না।

মানুষ রিয্কের অভাবে কষ্ট পায় কেন?

আল্লাহ দাবি করেছেন, তিনি সকল জীবের রিয্কের দায়িত্ব নিয়েছেন। মানুষ কি জীব নয়? তিনি তো ঘোষণা করেছেন, মানুষ তাঁর সেরা সৃষ্টি। তাহলে মানুষ সেরা জীব। অথচ দুনিয়ার লাখ লাখ মানুষ রিয্কের অভাবে মারা যাচ্ছে। আমাদের আশপাশেও দেখতে পাই, অনেক লোক রিয্কের অভাবে আধমরা হয়ে আছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ কি মানুষের বেলায় তাঁর দায়িত্ব পালন করেন না? আল্লাহ কি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারেন?

অথচ সূরা বাকারা'র ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে বলেছেন, "তিনি ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব জিনিস পয়দা করেছেন।" আমরা খেয়াল করলে এ কথাটি যে খুবই সত্য, তা সহজেই বুঝতে পারি।

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য আলো, বাতাস, আগুন, পানি, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবই তৈরি করেছেন। মানুষকে অন্য কারো প্রয়োজনে পয়দা করেননি। ঐসব জিনিস না হলে মানুষ বাঁচবে না; কিন্তু মানুষ না থাকলে ওদের কোনো অসুবিধা হবে না। মানুষ না থাকলে পশু-পাখির তো সুবিধা হওয়ারই কথা।

গরু-ছাগল মরলে শেয়াল-কুকুর-শকুন তা খায়। মানুষ মরলে তার দেহকে অন্য কোনো জীবকে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। কারণ, মানুষকে অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য পয়দা করা হয়নি; বরং সকল সৃষ্টিকেই মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে।

এটা কত বড় আজব কথা যে, অন্য কোনো জীব রিয্কের অভাবে কষ্ট পায় না। অথচ যে মানুষের জন্য সব কিছু পয়দা করা হয়েছে, সে মানুষই অভাবে ভোগে। যে পশু-পাখিকে মানুষের জন্য পয়দা করা হয়েছে, ওরা অভাবে কষ্ট পায় না, অথচ যে মানুষের জন্য ওদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে মানুষই অভাবে কষ্ট পায়। এটা কেমন কথা?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের সঠিক জবাব

মানুষের জন্য যত জিনিস দরকার তা পরিমাণমতো পয়দা করেন বলে আল্লাহ তাআলা বার বার কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন। তাই দুনিয়ার মানুষের জন্য খাবার জিনিসের অভাব নেই। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO— Food and Agricultural Organization) প্রায়ই ঘোষণা করে, বিশ্বে যত খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, যদি তা ঠিকভাবে বিলি-বণ্টন করা হয় তাহলে একজন মানুষেরও খাবারের অভাব হওয়ার কথা নয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বণ্টনব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই মানুষ রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পায়। এর আসল কারণ তালাশ করতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের রিয্‌কের জন্য জরুরি সকল জিনিস উৎপন্ন করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রেরণা দিয়েছেন। নিজেদের স্বার্থেই মানুষ রাত-দিন হাজারো জিনিস উৎপন্ন করার চেষ্টা করতে থাকে। সবাই তাদের উন্নতি চায়। তাই উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় মানুষ বের করে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টিজগৎকে উৎপাদনের ব্যাপারে মানুষের খিদমতে লাগিয়ে দেন। তাই মানুষের প্রয়োজন-পরিমাণেই সবকিছু উৎপন্ন হয়।

কিন্তু উৎপাদিত জিনিস ইনসাফের সাথে বিলি-বণ্টনের যে নিয়ম-নীতি আল্লাহ্ তাআলা নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, সে অনুযায়ী বণ্টন হয় না বলেই মানুষ রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পায়। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্য যত বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা জারি করার দায়িত্ব মানুষের উপরই দিয়েছেন। এটাই খিলাফতের দায়িত্ব।

রাসূল (স) ও তাঁর চারজন খলীফা আল্লাহর দেওয়া নিয়ম আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে পালন করতেন। কোনো মানুষ যাতে রিয্‌কের অভাবে কষ্ট না পায়, সে উদ্দেশ্যে তাঁরা চেষ্টা করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের এলাকা বেড়ে যখন অনেক দেশ তাঁদের শাসনের আওতায় আসে, তখন তাঁরা সকল সম্পদ ইনসাফের সাথে বণ্টন করতেন। যার ফলে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে যাকাত নেওয়ার মতো কোনো অভাবী পাওয়া যায়নি।

এতে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর বিধান চালু করার যোগ্য ঈমানদার ও নিঃস্বার্থ লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকলে আল্লাহর খিলাফত কায়েম থাকে এবং মানুষ রিয্‌কের অভাবে ভুগতে বাধ্য হয় না।

আজকাল দুনিয়ায় কেমন লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা রয়েছে, তা তাদের চরিত্র ও আচরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। শয়তানের খলীফাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকা অবস্থায় কিছুতেই আশা করা যায় না যে, আল্লাহর বিধানমতো

www.pathagar.com

মানুষ তাদের রিয্ক ঠিকমতো পেতে পারে। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ যে রিয্কের অভাবে মারা যাচ্ছে, এর জন্য আল্লাহ্ দায়ী নন। আল্লাহর বিধান যারা অমান্য করছে তারাই এর জন্য দায়ী।

একটা সহজ উদাহরণ

আমাদের দেশে অনেক যৌথ পরিবার আছে। ধরুন এক বাড়িতে চার ভাই এক পাকে (এক সাথে) খায়। সবাই বিয়ে করেছে এবং তাদের ছেলে-পেলেও আছে। তাদের বাপ-মা বেঁচে আছে বলে তারা বাপ-মায়ের সাথে এক বাড়িতেই থাকে। পিতার সম্পত্তি থেকেই পরিবার চলছে। চার ভাই যা রোজগার করে তাও পিতার হাতেই তুলে দেয়। এ পরিবারে তো অভাবই থাকার কথা নয়। পিতাই পরিবারের কর্তা। সংসারের জন্য যা কিছু কিনতে হয়, কোনোটারই অভাব হয় না।

পাকঘরের মূল কর্তৃত্ব চার ভাইয়ের মায়ের হাতে। মা রেওয়াজমতো চার বৌমার মধ্যে বড়-বৌকে পাকঘরের প্রধান দায়িত্ব দেন। সব বৌ-ই কাজ করে, কিন্তু পাক করা খাবার বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব বড় বৌ-ই পালন করে। পাক করার জন্য কী পরিমাণ চাল, ডাল, তরি-তরকারি, মাছ-গোশত দরকার, বড় বৌ তা শাশুড়ি থেকে চেয়ে নেয়। মা হিসাবমতো সব জিনিস বড় বৌ-এর হাতে তুলে দেন।

কিন্তু বড় বৌ খাবার বিলি করার সময় নিজের স্বামী ও ছেলে-মেয়েদের মাছের বড় বড় টুকরা, এতো বেশি পরিমাণ ভাত, তরকারি ও ডাল দিয়ে দেয় যে, তারা সব খেয়ে শেষ করতে পারে না। বাকিটা ঝুটা হিসেবে বিড়াল-কুকুরকে দিয়ে দেয়। শাশুড়ি তো সবার জন্য পরিমাণমতো জিনিস দিয়েছেন; ফেলার জন্য তো দেননি। ফলে অন্য ভাই, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য যে খাবার থাকে, তাতে তাদের পেট ভরে না।

এই যে পরিবারের অল্প কিছু লোক বেশি খেল এবং কিছু ফেলেও দিল, আর বাকি সবাই যে কম পেল– এর জন্য শাশুড়ি মোটেই দায়ী নয়। একমাত্র বড় বৌ-ই দায়ী।

দুনিয়ার সব মানুষ একই পরিবার

সকল আদমসন্তান আল্লাহর পরিবার। সারা দুনিয়া আল্লাহর সংসার। তিনি সকল দেশের মালিক। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের জন্য আলাদা আলাদা আল্লাহ নেই। সারা দুনিয়ায় যত খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা সকল মানুষের প্রয়োজন-পরিমাণই। তবু কেন অভাব?

www.pathagar.com

কোনো দেশের জন্য জরুরি সব জিনিস ঐ দেশেই উৎপন্ন হয় না। আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বিশাল এলাকায় এক বছরে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয়, তা তারা তিন বছরেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। মরুভূমির সব দেশের মানুষের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার, এর সামান্যও সেখানে উৎপন্ন হয় না। তবে মরুভূমির দেশে বালির নিচে এত পেট্রোল রাখা হয়েছে, যা না হলে ইউরোপ ও আমেরিকা অচল হতে বাধ্য।

বাংলাদেশে যত মানুষ আছে, উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ সে তুলনায় কম। আবার বাংলাদেশে যে উন্নতমানের পাট উৎপন্ন হয়, তা ইউরোপ-আমেরিকায় হয় না; কিন্তু তাদেরও পাটের দরকার আছে।

এভাবেই আল্লাহ মানুষের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দুনিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন। কোনো এক দেশে সব জিনিস উৎপন্ন হয় না। আল্লাহ চান যে, আদম সন্তানরা এক দেশের জিনিস অন্যান্য দেশের উৎপন্ন জিনিসের সাথে বিনিময় করুক এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

সূরা আল হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি; যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পারো।"

একটা গ্রামে খাঁ বংশ, সরকার বংশ, ব্যাপারি পাড়া ইত্যাদি কেবল পরিচয়ের জন্য বলা হয়; কাউকে ছোট বা কাউকে বড় মনে করে এভাবে বলা হয় না। বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা আছে। এ সবই শুধু পরিচয়ের জন্য। কোনো জেলার নাম মন্দ মনে করে উল্লেখ করা হয় না; পরিচয়ের জন্যই উল্লেখ করা হয়। তেমনিভাবে বিভিন্ন দেশকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, আমেরিকা ইত্যাদি নামে চিনতে হয়। সম্মান বা অসম্মানের জন্য কোনো দেশের নাম নেওয়া হয় না।

আল্লাহ চান যে মানুষে মানুষে, পাড়ায় পাড়ায়, জেলায় জেলায় সবাই সবাইকে চিনুক এবং জানুক। কেউ কাউকে মন্দ মনে না করুক। দেশে দেশে আদমসন্তানরা আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আদান-প্রদান করে যার যার প্রয়োজন পূরণ করুক। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি ও একই আদি পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে সবাই সবাইকে ভালোবাসুক। আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে সবাই সুখ-শান্তি ভোগ করুক।

www.pathagar.com

আল্লাহর পরিবারের কী দশা?

সারা দুনিয়ার আদমসন্তানের জন্য যা কিছু দরকার, সবই বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই উৎপাদনে সাহায্য করছেন। এক দেশের লোকের যে পরিমাণ জিনিস দরকার, সে দেশে উৎপন্ন জিনিসের সে পরিমাণের অতিরিক্ত জিনিস অন্য কোনো দেশের প্রয়োজন। ঐ দেশের কোনো অতিরিক্ত জিনিস এদেশে প্রয়োজন। এভাবেই সব দেশের লোক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস অন্য দেশ থেকে আমদানি করে এবং নিজেদের অতিরিক্ত জিনিস অন্য দেশে রফতানি করে। দেশে দেশে এভাবেই লেনদেন হয়।

যেমন– বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে গম কিনতে পারে। এর বদলে তারা বাংলাদেশ থেকে পাট কিনতে পারে। এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস বিনিময় করতে জিনিসের দাম ধরা হয়। এ দাম ধরার বেলায়ই এক দেশ আরেক দেশের প্রতি যুলুম করে। যুলুমের ধরনটা কেমন, তা উদাহরণ দিলে সহজে বুঝা যাবে।

বাংলাদেশের গম দরকার। অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশ গম নিতে চায়। এর বদলে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে পাট নিতে চায়। গম ও পাটের দর ঠিক করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য গম জরুরি, সেহেতু অস্ট্রেলিয়া বেশি দাম দাবি করল। পাট এমন জিনিস নয়, যা না নিলে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ মরবে। তাই তারা খুব কম দামে পাট কিনতে চাইল। বাংলাদেশ সমস্যায় পড়ে গেল। পাট উৎপাদন করতে যে খরচ পড়েছে এর চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাংলাদেশকে বাধ্য করলে অবশ্যই এটা যুলুম। অথচ গম উৎপন্ন করতে যে খরচ হয়েছে এর কয়েক গুণ বেশি দামে বাংলাদেশকে গম কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভাবখানা এমন, এ দামে গম কিনলে কিনতে পার, না কিনলে পাট খেয়ে মর গিয়ে। অনেক দেশ সাধ্যের বেশি দামে গম কিনতে না পারায় অস্ট্রেলিয়ার গুদামে এত গম জমা হয়ে রইল যে, অনেক গম তারা পশুকে খাওয়াতে বাধ্য হলো। এমনকি অনেক গম পচে গেল, যা সমুদ্রে ফেলতে হলো। এটা গল্প নয়, এমনই হচ্ছে বলে পত্রিকায় খবর বের হয়।

এ একটা উদাহরণ থেকেই সমস্যাটা সহজে বুঝা যায়। কোনো কোনো দেশে গম পশুকে খেতে দেওয়া হয়, সমুদ্রেও ফেলে দেওয়া হয়, অথচ অন্য কোনো দেশে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যায়।

উপরে শাশুড়ি ও বড় বৌ-এর ভূমিকার উদাহরণটি থেকে বিষয়টি এভাবে বুঝতে পারা যায়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যই খাদ্য পয়দা করেন। কিন্তু ধনী দেশগুলোতে যারা বড় বৌ-এর ভূমিকা পালন করছে তাদের দোষেই লাখ লাখ আদমসন্তান না খেয়ে মরছে। তারা নিজের দেশের মানুষকে যে

www.pathagar.com

পরিমাণ খাবার জিনিস অপচয় করতে দিচ্ছে, পশুকে পর্যন্ত খাওয়াচ্ছে এবং পচিয়ে নষ্ট করছে, সে খাদ্যটুকু পাওয়া যাদের হক ছিল তারা না খেয়ে মরছে। আল্লাহ তো পরিমাণমতোই পয়দা করছেন, পশুকে খাওয়ানোর জন্য বা পচানোর জন্য তো উৎপন্ন করছেন না। শাশুড়ি পরিমাণমতো সব জিনিস দিয়েছেন; কিন্তু বড় বৌ-এর দোষে পরিবারের অন্যরা খাবার কম পাচ্ছে।

ইনসাফের কথা

জাতিসংঘ কয়েকটি বড় দেশের হাতে বন্দি। ১৯১টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের সভায় এ পর্যন্ত অনেক ইনসাফপূর্ণ প্রস্তাব পাস হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের হাতে প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিষদের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন বড় দেশগুলোর প্রতিনিধি। তাদের প্রত্যেককে এ ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, যেকোনো প্রস্তাব তাদের যে কেউ নাকচ করে দিতে পারে। ২০০৩ সালে জাতিসংঘের মতের বিরুদ্ধে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘ গঠন করা হয়; কিন্তু এ যুদ্ধ বন্ধ করা গেল না।

সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য। এটা দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের একটা সমিতি। কিন্তু বড় কয়েকটি রাষ্ট্রের হাতে এমন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে যে, সমিতির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ সমিতি ছোট রাষ্ট্রগুলোর উপর দাপট দেখাতে পারে। কিন্তু ৫টি বড় রাষ্ট্রের কারণে এ সমিতি ইনসাফ করতে পারে না।

ইহুদিরাষ্ট্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে এ সমিতির কোনো হুকুমই আমেরিকা জারি করতে দেয়নি। ফিলিস্তিনের পক্ষে সমিতির কোনো প্রস্তাবই আমেরিকা সমর্থন করেনি। কাশ্মীরের পক্ষে সকল প্রস্তাবই রাশিয়া নাকচ করে ভারতকে কাশ্মীরের উপর চরম যুলুম করতে সাহায্য করেছে। এভাবে বড় কয়েকটি রাষ্ট্র দুনিয়ায় যুলুম চালু রেখেছে।

সব দেশের উৎপাদিত জিনিস যাতে ইনসাফপূর্ণ দরে সবাই নিতে পারে এবং লেনদেনে কারো উপর কেউ যুলুম করতে না পারে এমন প্রস্তাব যদি ঐ সমিতি পাস করে তাহলে যেসব দেশ অন্য দেশ থেকে খাবার জিনিস কিনতে বাধ্য হয় তারা যুলুম থেকে বাঁচতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সমিতিকে এ প্রস্তাব পাস করতে হবে যে, কোনো জিনিস উৎপন্ন করতে যে খরচ হয়, সে জিনিস শতকরা ১০ বা ১৫ ভাগ লাভে বিক্রি করতে হবে। দুনিয়ার সব দেশে এ রকম একই আইন জারি করতে পারলে কেউ যুলুমের শিকার হবে না। এ জাতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে স্বার্থপর বড় রাষ্ট্রগুলো কি রাজি হবে?

www.pathagar.com

দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক শিকলে আবদ্ধ হওয়ার কারণে ছোট দেশগুলোকে যেসব সমস্যায় পড়তে হয় সে বিষয়ে কিছু ধারণা উপরে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, আঞ্চলিক ব্যাংক ও বড় দেশগুলো সাহায্যের নামে যা দেয়, তার একটা বড় অংশ তাদের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের পেছনে খরচ হয়ে যায়। আর ধার বা ঋণ হিসেবে যা দেয় তা সুদসহ ফেরত দেওয়া বিরাট কঠিন ব্যাপার।

সরকার ঐ সব ঝামেলাসহই দেশের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যে দলই সরকারি ক্ষমতায় থাকে, তারা পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের সমর্থনের আশায় যত কর্মসূচি গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে বাস্তবে চালু করতে পারলে দেশ এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যাদের হাতে তা চালু হয়, তাদের দুর্নীতির কারণে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয় না। ঈমানদার ও যোগ্য লোকের শাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

আমরা ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে যা আলোচনা করছি তা জানা জরুরি বলেই লিখছি। কিন্তু সৎ লোকের শাসন কায়েম না হলে ইসলামী অর্থনীতি চালু হবে না।

দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

বর্তমান দুনিয়াতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, এর নাম হলো পুঁজিবাদ ।

১৯১৭ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত রাশিয়ার নেতৃত্বে আরেক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেশ কয়টি দেশে চালু ছিল। এর নাম সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র। কমিউনিজম নামেও এর পরিচয় ছিল। সমাজতন্ত্র তার জন্মভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করেছে। ঐ অর্থনীতি অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে আবার পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ মানুষকে অর্থনৈতিক গোলাম বানায়। আর সমাজতন্ত্র জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় গোলামে পরিণত করে। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি দলের হাতে তুলে দিয়ে জনগণকে সকল দিক দিয়ে দাস বানিয়েছিল, আর পুঁজিবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে জনগণকে পুঁজিবাদীদের অর্থনৈতিক গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

এত বড় কঠিন বিষয় জনগণের বুঝার মতো সহজ করে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সমাজতন্ত্র অনিবার্য মৃত্যুবরণ করেছে বলে সে বিষয়ে আলোচনার দরকার নেই। পুঁজিবাদ যেহেতু চালু আছে এবং আমরা এর অধীনেই আছি, সেহেতু এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা জরুরি।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী অর্থনীতি

পুঁজি মানে উৎপাদন উপযোগী টাকা। মানুষের দরকার খাবার, কাপড় ও অন্যান্য অনেক জিনিস, যা সবাই ব্যবহার করে। কেউ টাকা খায় না, টাকা গায়ে দেয় না, টাকা সরাসরি ব্যবহার করে না। টাকা কোনো পণ্য নয়। পণ্য আদান-প্রদান বা বিনিময় করতে টাকা কাজে লাগে। ছোট একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

চাষী জমিতে ফসল বুনে ধান উৎপাদন করল। তাঁতী ঘরে কারখানায় কাপড় তৈরি করল। চাষী কাপড় কিনতে চায়, আর তাঁতী চাল কিনতে চায়। চাষী কি চালের বস্তা নিয়ে তাঁতীর কাছে কাপড় কিনতে যায়? তাঁতী কি কাপড়ের বস্তা নিয়ে চাষীর বাড়িতে চাল কিনতে যায়? চাল ও কাপড় বিনিময় করার এ নিয়ম মোটেই সুবিধাজনক নয়। তাই সহজ নিয়ম চালু হয়েছে যে, চাষী বাজারে চাল বিক্রি করে টাকা নেবে, তাঁতী কাপড় বেচে টাকা নেবে। ঐ টাকা দিয়ে যার যে জিনিস দরকার সে তা কিনবে। সুতরাং টাকা হলো পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যম; টাকা কিন্তু কোনো পণ্য নয়। মানুষের পণ্য দরকার। টাকা পণ্য কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়। টাকা কোনো পণ্য বানায় না, টাকা দিয়ে পণ্য কেনা হয় মাত্র।

পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো সুদ। যার কাছে বেশি টাকা আছে সে অন্যকে ঐ টাকা সুদের উপর ধার দেয়। অর্থাৎ টাকা দিয়ে আরও টাকা কামাই করে। পুঁজিওয়ালা নিজে টাকা কামাই করতে পারে না। যে টাকা ধার নেয় সে লোকটি কামাই করে। পুঁজিওয়ালা কোনো কিছু না করেই ঐ লোকের কামাই থেকে সুদ দাবি করে। এটা শোষণ বা যুলুম। তাই ইসলাম সুদকে জঘন্য হারাম ঘোষণা করেছে।

একজনের পুঁজি আরেকজন নিয়ে কাজে লাগিয়ে যা লাভ করল ঐ লাভের অংশ টাকাওয়ালা নিলে সুদ হবে না। যদি লাভ না হয় তাহলে কিছুই পাবে না। এ শর্তে ধার দিলেও নিলে দোষ নেই। এতে শোষণ হবে না। পূর্ব-চুক্তি মোতাবেক লাভের একটা অংশ নিলে ব্যবসায় শরীক হিসেবে লাভ পাবে। টাকা দিয়ে ব্যবসায় লাভ না হলেও সুদ নেওয়াটাই যুলুম।

টাকার মালিকরা ব্যাংকের মাধ্যমে সুদে টাকা লগ্নি করে জনগণকে শোষণ করে তাদের টাকার অংক বাড়িয়ে অন্যায়ভাবে দেশের সম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছে, আর জনগণ সুদ দিতে দিতে আরও গরীব হচ্ছে। পুঁজিবাদীরা টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। যারা ধার নিচ্ছে তাদের লাভ না হলেও এমনকি লোকসান হলেও সুদ আদায় করতেই হবে। বাড়ি-ঘড় বেচে হলেও সুদ দিতে হবে। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি চরম যুলুম ও শোষণ।

www.pathagar.com

সুদের কুপ্রথা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। গরীব লোকেরা উচ্চহারে সুদের উপর টাকা নিয়ে ফতুর হচ্ছে। আর টাকার গোলামরা গরীবদের রক্ত শোষণ করে চলেছে।

পুঁজিবাদ টাকাওয়ালার মধ্যে যে মনোভাব পয়দা করে, তাতে টাকাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। টাকার অংক বাড়ানোর জন্যই তার সকল চিন্তাধান্দা। টাকার লোভ তাকে পেয়ে বসে। তার সুদী ব্যবসা দেশ, জাতি ও জনগণের কোনো উপকারে লাগছে কি-না সে কথা চিন্তাও করে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি গোটা সমাজকে লোভী ও স্বার্থপর বানায়। এ কারণেই লটারি, বহু রকমের জুয়া, ঘুষ ও অনেক রকম অসৎ উপায়ে আয় করার কু-প্রথা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী মনোভাব মানুষকে টাকার পাগল বানায়। তাই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটপাট, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। মানুষ নৈতিক চেতনা হারিয়ে টাকা ছাড়া কিছুই বুঝছে না।

ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো যাকাত। সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ কুরআনের বিধান মোতাবেক দান করাকে যাকাত বলা হয়। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থাটা মানুষকে অনেক কথা শেখায়। যেমন–

১. পয়লাই যাকাতদাতা বুঝে নেয় যে, তার কামাই করা মালের আসল মালিক সে নয়। আসল মালিক আল্লাহ; যার হুকুমে তার কামাই করা মালের একটা নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের জন্য দিয়ে দিতে হয়। সে টাকার গোলাম নয়, আল্লাহর গোলাম।

২. হালাল কামাই থেকে যাকাত দিতে হয়। এর দ্বারা তাগিদ দেওয়া হয় যে, হারাম পথে কামাই করা যাবে না।

৩. যাকাত দেওয়ার পর তার হাতে যত টাকা আছে এর আসল মালিক যেহেতু আল্লাহ, সেহেতু এ টাকা হালাল কাজেই খরচ করতে হবে। হারাম কাজে ব্যয় করার অধিকার তার নেই।

৪. যাকাত গরীবের প্রতি যাকাতদাতার দয়া নয়; ধনীর ঘরে এটা গরীবের হক বা অধিকার, যা সরকারের হাতে তুলে দিতে হয়। এতে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই। এটা আল্লাহর হুকুম, তিনি এ বিষয়ে হিসাব নেবেন।

৫. যাকাত সরকারি ব্যবস্থাপনায় ধনীদের কাছ থেকে উসুল করে, যাদের হক তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। গরীবকে ধনীর দুয়ারে এসে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে নিতে হবে না। সরকার তার হক তার ঘরে সম্মানের সাথে পৌঁছে দেবে। এটাই ইসলামী নিয়ম।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজে যাকাতব্যবস্থা জনগণের মাঝে এ মনোভাবই সৃষ্টি করে যে, ধন-সম্পদ হালাল উপায়ে হাসিল করতে হবে। আল্লাহকে এর আসল মালিক মনে করতে হবে, ধনীর মালে গরীবের হক রয়েছে। আল্লাহর দেওয়া মাল মানুষকে শোষণ করার জন্য ব্যবহার করা চলবে না; বরং আল্লাহকে খুশি করার জন্য অন্যদেরকে দান করতে হবে। টাকা-পয়সা ও ধনসম্পদ জীবনের আসল উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য দুনিয়ায় আল্লাহর সাচ্চা বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করা, যাতে আখিরাতে সফল হওয়া যায়। এ আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য টাকা-পয়সা কাজে লাগাতে হবে।

যাকাত সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে

সমাজে কোনো না কোনো কারণে কিছু লোকের অভাব থেকে যায়। আল্লাহ এ জাতীয় লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য যাকাত ফরয করেছেন। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে তিনি তাদের তালিকা দিয়েছেন। অন্য কোনো কাজে যাকাতের টাকা খরচ করা যাবে না। কুরআনে যাকাতের ৮টি খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

১. ফকীর– যারা এত গরীব, অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয় তাদের জন্য।
২. মিসকীন– যারা অভাবী হলেও লজ্জায় কারো কাছে চায় না, তাদের সাহায্যের জন্য।
৩. সরকারের যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য।
৪. নতুন মুসলমান– যাদের মন জয় করা দরকার। নওমুসলিমদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যও যাকাত দেওয়া যাবে।
৫. দাসদের মুক্তির জন্য বা জরিমানা আদায় না করতে পারায় যারা জেলে পড়ে আছে তাদের মুক্তির জন্য।
৬. ঋণগ্রস্তদেরকে ঋণের বোঝা থেকে উদ্ধার করার জন্য।
৭. আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য।
৮. মুসাফির অবস্থায় অভাবে পড়ে গেলে তার অভাব দূর করার জন্য। নিজের বাড়িতে কেউ ধনী হলেও মুসাফির অবস্থায় অসহায় হতে পারে।

সব ধরনের অভাবী লোকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মহান উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা যাকাত ফরয করেছেন এবং এটাকে বড় ইবাদত হিসেবে গণ্য করেন। ইসলামে ভিক্ষা করা অত্যন্ত মন্দ। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য যাকাত জরুরি। যারা গরীব অথচ হাত পাতে না, তাদেরকে খুঁজে বের করা সরকারের বিরাট দায়িত্ব। ধনীদের থেকে যাকাত উসুল করা ও হকদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য যারা কাজ করবে, তাদের বেতন যাকাত থেকেই দিতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী সরকারের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হলে প্রথমে ইসলামী সরকার কায়েম করতে হবে। ইসলামী সরকারকে আল্লাহ যেসব অর্থনৈতিক নির্দেশ (হুকুম) দিয়েছেন, তা দেশে চালু করা হলে জনগণ কেমন সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারবে তা ঐ নির্দেশগুলো থেকেই বোঝা যায়। ইসলামী সরকারের জন্য আল্লাহর দেওয়া ৪ দফা কর্মসূচির প্রথম দফা হলো, জনগণের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে নামায কায়েমের ব্যবস্থা করা। এর পরই দ্বিতীয় দফা হলো যাকাত ব্যবস্থা চালু করে সকল আদমসন্তানের রিয্‌কের অভাব দূর করে আল্লাহর খিলাফতের প্রধান দায়িত্ব পালন করা। সৃষ্টিজগতে কোনো জীবকে আল্লাহ রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত থাকতে দেন না। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ যদি রিয্‌কের অভাবে কষ্ট পায় তাহলে খিলাফতের আসল দায়িত্বই পালন করা হলো না।

এ দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করার জন্য ইসলামী সরকারকে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে :

১. রাসূল (স) বলেছেন, "আদমসন্তানের এ কয়টি ছাড়া আর কোনো হক নেই– থাকার মতো ঘর, সতর ঢাকার-পরিমাণ কাপড় এবং শুকনা রুটি ও পানি।" বাঁচার জন্য মানুষের কমপক্ষে এ তিনটি জিনিসই জরুরি– বাসস্থান, কাপড় ও ভাত। এ তিনটি প্রতিটি মানুষের হক বলে ঐ হাদীসে বলা হয়েছে। এ হক কে পৌঁছাবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামী সরকারকেই তা পৌঁছাতে হবে।

   এ হাদীসের মর্ম হলো, এ তিনটি মানুষের হক। এর অতিরিক্ত যা মানুষ পায় তা আল্লাহর দয়া, যার হিসাব দিতে হবে। যা হক এর কোনো হিসাব দিতে হবে না। এ তিনটি হক যে পায়, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার তার কোনো অধিকার নেই। কারণ, তার হক শুধু এটুকুই। আর সবই আল্লাহর নিয়ামত।

২. রাসূল (স) বলেছেন, "হালাল রুজি তালাশ করা অন্য সব ফরযের পর ফরয।" বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া সবার উপরই হালাল কামাই করা ফরয। ইসলামী সরকারকে যেমন ফরয নামায কায়েম করার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি সবাইকে হালাল পথে আয়-রোজগার করার ফরযটি আদায় করার সুযোগ দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতে হয়। সরকার দায়িত্ব পালন করলেই সবার রিয্‌ক সহজে যোগাড় হতে পারে।

   সরকার যদি বাংলাদেশের সকল বেকার যুবকদেরকে অর্থকরী কাজ শেখার ব্যবস্থা করে, তাহলে অশিক্ষিত যুবকরাও দেশে-বিদেশে কাজ করে দেশকে সম্পদশালী করে দিতে পারে।

www.pathagar.com

৩. সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, "আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দাও এবং গরীব ও মুসাফিরদেরকেও তাদের হক দিয়ে দাও। অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"

আল্লাহ সব জিনিস পরিমাণমতো পয়দা করেন। যদি কেউ অপব্যয় বা অপচয় করে তাহলে অন্য লোকের অভাব অবশ্যই হবে। অপব্যয় কয়েক রকমের হয়। যেমন– ক. কোনো জিনিস নষ্ট করা। খ. যতটুকু জিনিস দরকার এর চেয়ে বেশি ব্যবহার করা। গ. হারাম কাজে খরচ করা।

৪. আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন তা করতে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। এসব কাজ থেকে ফিরে থাকতে কোনো খরচ হয় না। মদ খাওয়া, যিনা করা, নাচের আসর জমানো, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার আয়োজন করা ইত্যাদিতে বিপুল সম্পদের অপচয় হয়। এসব বন্ধ করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য।

যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তারাই এ জাতীয় অপব্যয় করে। যদি এসব বন্ধ করা হয়, তাহলে ঐ সম্পদ তারা এমন কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য হবে, যা উৎপাদন বাড়ায়। টাকা-পয়সা তো খেয়ে ফেলার জিনিস নয়। তা কোনো না কোনো কাজে লাগাতেই হয়। হারাম কাজের সুযোগ বন্ধ করা হলে তা উৎপাদনেই লাগাতে হবে। সুদে লগ্নি করার সুযোগও থাকবে না। সুতরাং তাদের টাকা মানুষের উপকারেই লাগবে।

৫. রাসূল (স) বলেছেন, "ঘুষ যে নেয় আর ঘুষ যে দেয়– দুজনই দোযখে যাবে।" তাই ইসলামী সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ঘুষপ্রথা চালু হতে না পারে। অর্থনৈতিক জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো ঘুষ। ঘুণ যেমন ভেতর দিয়ে কাঠকে খেয়ে শেষ করে, ঘুষ তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। যেমন–

ক. যারা ঘুষ না পেলে কাজ করতে চায় না, তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিনা ঘুষে কাজ করে না। তাই তাদের যোগ্যতা কাজে লাগে না।

খ. ঘুষ দিতে রাজি না হলে তারা হকদারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

গ. ঘুষ দিলে যার হক নেই তাকেও তারা অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার দিয়ে দেয়।

ঘ. ঘুষ সব আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে অচল করে দেয়। আইন যতই ভালো হোক, ঘুষ চালু থাকলে তা জনগণের উপকারে আসতে পারে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ঘুষের কুফল

দুর্নীতিপরায়ণ দেশের তালিকায় ১৯৯৯ সাল থেকেই সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশ এক নম্বর দেশ হিসেবে নিন্দিত। এর প্রধান কারণই হলো ঘুষ। সরকারি অফিস থেকে কোনো কাজ আদায় করতে হলে বিনা ঘুষে কিছুতেই তা সম্ভব নয়। বড় কর্মকর্তা থেকে পিয়ন পর্যন্ত ঘুষের নেশায় পাগল। শতকরা কতজন ঘুষ খায় না তা আল্লাহই জানেন। রাজধানী ঢাকায় পর্যন্ত খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ বন্ধ হচ্ছে না। এ সবের জন্য কঠোর শাস্তির আইন আছে; কিন্তু ঘুষের কারণে আইন অচল।

পুলিশকে টাকা দিলে খুনীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে যায়। তাই খুনী খুন করার সময় আইনের পরওয়া করে না।

পুলিশ যদি ডাকাত থেকে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়, তাহলে ডাকাতি কমে যাওয়ার বদলে বাড়বেই।

কোটি কোটি টাকার কারখানা কায়েম করতে সরকারি অনুমতি নিতে হয়। অফিসারকে এ কাজের জন্য বেতন দেওয়া হয়; কিন্তু লাখ টাকা ঘুষ না দিলে অনুমতি পাওয়া যায় না।

টেলিফোনের জন্য সরকারকে ফিসের টাকা দেওয়ার পরও কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ঘুষ দিতে হয়। এরপরও লাইনম্যানকে ঘুষ না দিলে ঘরে টেলিফোন লাইন আসে না।

ওয়াসা'র পানির বিল ঘুষ দিলে কমিয়ে দেয় এবং সরকারকে ঠকিয়ে কর্মচারী ধনী হয়।

বিদ্যুৎ-চোরদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ইনস্‌পেকটর চুরি করতে দেয়। এর ফলে যারা নিয়মিত বিল আদায় করে তাদের বিলে চুরি হওয়া বিদ্যুতের বিল যোগ হয়। চুরির কারণে বিদ্যুতের দামও বেড়ে যায়।

এমনকি স্কুল-মাদরাসা বোর্ডেও শিক্ষকরা ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ আদায় করতে পারে না। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বেলায় টাকা দিতে না পারলে যোগ্য শিক্ষকও চাকরি পায় না। টাকা দিয়ে নিম্নমানের শিক্ষকও চাকরি পেয়ে যায়।

ব্যাংক থেকে সুদের উপর টাকা ধার নিলেও কর্মচারীদেরকে ঘুষ না দিলে ধারের টাকা হাতে আসে না।

বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুষের রাজত্ব। অল্প কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম। ঘুষের দাপটে মেধা ও যোগ্যতার মূল্য নেই। একটু খেয়াল করলেই অনুভব করা যায় যে, ঘুষপ্রথা না থাকলে মানুষের জীবনে শান্তি কত বেড়ে যেতে পারে! তাই ইসলামী সরকারকে ঘুষপ্রথা খতম করতেই হবে।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক জীবন

আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি যে, ইসলাম আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের জন্য কেমন চমৎকার বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছে। যারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে তাদের জীবন, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি এক ধরনের হবে। যারা সে শিক্ষা গ্রহণ করবে না তারা মনগড়া নিয়মে কিংবা অন্যদের শেখানো তরীকায় চলবে। ফলে সঙ্গত কারণেই তাদের জীবন, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি আলাদা ধরনের হবে।

এ কারণেই মুসলিম ও অমুসলিমের জীবনধারা একই রকম হতে পারে না।

একজন মুসলিম সূর্য ওঠার বেশ আগে ঘুম থেকে উঠে পেশাব-পায়খানা সেরে পবিত্র হয়ে ওযূ করে, নামাযের পোশাক পরে মসজিদে গিয়ে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করে। এরপর হয় মসজিদে বসেই সে কুরআন তিলাওয়াত করে, আর না হয় বাড়িতে এসে কুরআন পড়ে। মসজিদে আসা-যাওয়ার সময় কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হলে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে শুভেচ্ছা জানায়।

একজন অমুসলিমের এত সকালে ঘুম থেকে উঠার দরকার হয় না। যখন খুশি ঘুমায়, যখন উঠা দরকার তখন উঠে পেশাব-পায়খানা করে মুখ ধুয়ে তার অভ্যাসমতো যা করার তা-ই করে। পেশাব-পায়খানার নিয়মও তার আলাদা। তার পাক-পবিত্র হওয়ার কোনো ধারণাই নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েও তারা নাপাক থাকতে পারে।

মুসলমানের কথাবার্তা বলার ধরনও অমুসলিমের থেকে আলাদা। কেউ তাকে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করলে জবাবে সে বলে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ! ভালো আছি।' কোনো অমুসলিম এভাবে বলে না।

একটি মুসলিম পরিবারের মেয়ে শরীর ভালোভাবে ঢেকে বাড়ির বাইরে যায়। অমুসলিম মেয়েদের মতো পোশাক পরে বাইরে যায় না। একজন মুসলিম মহিলা বাড়ির বাইরে অন্য মানুষকে তার দেহের সৌন্দর্য দেখায় না।

এ অল্প ক'টি উদাহরণই এ কথা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট যে, স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম ও অমুসলিমদের চলা, বলা, করা, খাওয়া, পরা ইত্যাদি প্রায় সব কিছুতেই কিছু না কিছু ভিন্নতা ও পার্থক্য দেখা যায়।

আমাদের দেশে গ্রামের দিকে অশিক্ষিত মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কিছুটা তফাৎ দেখা গেলেও শহরে বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে মুসলিমদের অনেককে অমুসলিমদের মতোই চলতে দেখা যায়। এর কারণ এটাই যে, তারা ইসলামী

www.pathagar.com

শিক্ষা ঠিকমতো পায়নি। কেন পায়নি সে কথাও বলা দরকার। তা না হলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এর জন্য তারা মোটেই দায়ী নয়। তাহলে দায়ী কারা?

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান মিলে এত বিশাল এলাকা যে, একে উপমহাদেশ বলা হয়। এ এলাকায় ৭০০ বছর মুসলিম শাসন ছিল। বাংলাদেশ এলাকায় এ শাসন সাড়ে ৫০০ বছর ছিল। ঐ সময় যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তার ফলে সকল শিক্ষিত লোকই ইসলামী শিক্ষালাভের সুযোগ পেত। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা বাংলাদেশ দখল করার পর ঐ শিক্ষাব্যবস্থা উৎখাত করে তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে; যাতে তাদের মন-মগজ-চরিত্রের অনুরূপ লোক তৈরি হয়। ১৯০ বছর আমরা ইংরেজদের গোলাম ছিলাম। ১৯৪৭ সালে আমরা ইংরেজ থেকে স্বাধীন হয়েছি। তখন থেকে এ দেশে মুসলিম শাসনই চলছে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে ধরনের মন-মগজ ও চরিত্রের লোক তৈরি করেছে, সে ধরনের লোকেরাই দেশ শাসন করছেন। তারা নামে মুসলিম হলেও ইসলামী শিক্ষায় গড়ে ওঠেন নি। ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ হলাম। ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের শিক্ষাব্যবস্থাই জারি রইল। ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হলেও ইসলামী সরকার কায়েম হয়নি।

১৯৭১ সালে এ দেশ পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আলাদা হলো। যাদের হাতে বাংলাদেশ শাসন করার ক্ষমতা এলো তারা শিক্ষাব্যবস্থায় নিচের দিকে সামান্য যেটুকু ইসলামী শিক্ষা ছিল তা-ও উঠিয়ে দিলেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় ইসলামের শুধু ধর্মীয় শিক্ষাটুকু আছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার সামান্য থাকলেও মূলত ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থাই চালু আছে।

এ অবস্থায় এ দেশের শিক্ষিত লোকদের মন-মগজ-চরিত্র ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তৈরি হতে পারছে না। এর জন্য তারা দায়ী নয়। যারা দেশ শাসন করছেন তারাই দায়ী। তাই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়লেও মুসলিম শিক্ষিতদের অনেকের চালচলনের ধরন দেখতে অনেকটা অমুসলিমদের মতোই মনে হয়। অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী না হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত লোককে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিংবা পারিবারিক প্রভাবে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে দেখা যায়।

মুসলিম ও অমুসলিম জীবনে তফাৎ কোথায়?

মুসলিম ও অমুসলিম সবাই আদমসন্তান। সবাই মানুষ। সবাই ঘুমায়, ঘুম থেকে উঠে, পেশাব-পায়খানা করে, খায়, বিয়ে-শাদি করে, আনন্দ-উৎসব করে,

www.pathagar.com

আয়-রোজগার করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, মারা যায় এবং মরার পর তাদের দেহকে জীবিতরা সৎকার করে। মানুষ হিসেবে সব মানুষকেই এসব করতে হয়।

এসব কাজ মুসলিমদেরকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী করতে হয়। অমুসলিমরা এর সবই অন্যভাবে করে। মুসলিমরা কিবলার (মক্কার কাবা শরীফ) দিকে পা দিয়ে ঘুমায় না। কিবলার দিকে মুখ করে ও পিঠ রেখে পেশাব-পায়খানা করে না। তাদের পেশাব-পায়খানার জায়গা সেদিকে খেয়াল রেখেই তৈরি করা হয়। ইসলামের দেওয়া হালাল ও হারামের বিধান মেনে তারা খাওয়া-দাওয়া করে। যেসব জিনিস খাওয়া হারাম তা খায় না। হালাল পশুও জবেহ্ করার সময় আল্লাহু আকবার না বললে হারাম হয়ে যায়। খাবার শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়। খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে শুকরিয়া জানাতে হয়।

মুসলিমদেরকে ইসলামের শেখানো নিয়মে বিয়ে করতে হয়। যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম তাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করে না। আয়-রোজগার করতে হালাল উপায় তালাশ করে এবং হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায়ও হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হয়।

ইসলামে আনন্দ-উৎসবের বিধানও রয়েছে। ঈদ শব্দের মানেই খুশি ও আনন্দ। এ আনন্দ শুরু করতে হয় নামায দিয়ে। এর দ্বারা শেখানো হয় যে, এমন ধরনের আনন্দ ফুর্তি করা যাবে না, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। মুসলিমদের আনন্দবিনোদন যেন নৈতিক বিধান অমান্য না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

মারা গেলে মুসলমানদের মৃতদেহকে গোসল করিয়ে, কাফনের কাপড় পরিয়ে, সম্মানের সাথে কবরে দাফন করা হয়।

এসব কাজ অমসুলিমরাও করে। তবে মুসলমানরা যে নিয়মে করে অমুসলিমরা সে নিয়মে করে না। তারা আলাদা নিয়মে করে। হিন্দুরা একভাবে করে, খ্রিস্টানরা আরেকভাবে করে। প্রত্যেক জাতির লোক নিজ নিজ নিয়মেই ঐসব কাজ করে থাকে।

সংস্কৃতি কাকে বলে?

সকল ধর্ম ও সকল দেশের মানুষই উপরিউক্ত কাজগুলো নিজ নিজ নিয়মে করে থাকে। ঐ নিয়মগুলোই হলো সংস্কৃতি। বাংলায় কৃষ্টি শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। ইংরেজিতে Culture, সে হিসেবেই মুসলিম কালচার, হিন্দু কালচার, খ্রিস্টান কালচার ইত্যাদি বলা হয়। দেশ হিসেবেও আমেরিকান কালচার, জাপানি কালচার, চাইনিজ কালচার ইত্যাদি নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

এর দ্বারা বোঝা গেল, এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে জীবনযাপনের নিয়মে যে তফাৎ আছে ঐ তফাৎটাই সংস্কৃতি বা কালচার। খায় সবাই। খাওয়াটা সংস্কৃতি নয়। খাওয়ার নিময়টাই সংস্কৃতি। সব মানুষকে যা কিছু করতে হয় তা করার নিয়ম বা পদ্ধতি দেখেই বলা যায়– কে কোন্ কালচারের লোক, কে কোন্ জাতির মানুষ। এভাবেই মানুষের চালচলন থেকে তার সংস্কৃতি কী তা জানা যায়।

সংস্কৃতি কাকে বলে– এ নিয়ে শিক্ষিত মহলে বিরাট তর্ক-বিতর্ক চলে। এ বিতর্কে সাধারণ জনগণের কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়। তাই অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই। অতি সহজ কথায় আমরা বুঝে নিলাম, মানুষ সকল কাজ-কর্মে ও চলায়-বলায় যেসব নিয়ম-কানুন মেনে চলে তা-ই সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও কালচার।

যারা আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু, রাসূল (স)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা, আখিরাতের জীবনে সাফল্য-লাভকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস করে দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম করে তারা আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো নিয়মেই করে থাকে। এসব বিশ্বাসই সংস্কৃতির মূল। যারা এসব বিশ্বাস করে না তারা যে রকম বিশ্বাস করে তাদের কাজের নিয়ম সে রকম হওয়ারই কথা। তাদের সংস্কৃতির মূল ভিন্ন। ঐ মূলটুকুকেই বলা হয় সভ্যতা বা Civilization. তাই ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিমূল হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি মূলের ভিত্তিতে যাদের জীবন গড়ে ওঠে তারাই মুসলিম জাতি। তাদের মূলকেই বলে ইসলামী সভ্যতা। এ সভ্যতার ভিত্তিতেই ইসলামী সংস্কৃতির জন্ম হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শুধু বড় শহরেই নয়, ছোট শহরেও এমনকি হাটবাজারেও নাচ-গান, নাটক, কবিতা পাঠ, কৌতুক ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'। সংস্কৃতি শব্দ থেকেই সাংস্কৃতিক শব্দটি এসেছে।

পশুর মতো শুধু শরীরটুকু নিয়েই মানুষ নয়। মানুষের মন আছে, যা পশুর নেই। তাই মানুষ রাত-দিন পশুর মতো শুধু খেয়ে ও ঘুমিয়ে জীবন কাটায় না। মানুষের মনের খোরাকেরও দরকার হয়। পশুও দেখতে পায় যে, রাত যায় দিন আসে, আবার দিন যায় রাত আসে, সূর্য উঠে ও ডোবে। কিন্তু এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা পশুর নেই। মন আছে বলেই মানুষ যা কিছু দেখে এর চেয়েও বেশি চিন্তা করে। এ চিন্তা প্রকাশ না করলে মানুষ মনে শান্তি পায় না। বিভিন্নভাবে মানুষ ঐ চিন্তাকে প্রকাশ করে।

কেউ কবিতার মাধ্যমে তার চিন্তা প্রকাশ করে। কেউ গান গেয়ে নিজের চিন্তা প্রকাশ করে। কেউ বই লিখে চিন্তা প্রকাশ করে। কেউ নাটক লিখে চিন্তা প্রকাশ

www.pathagar.com

করে। নাটককে আবার মঞ্চে অভিনয় করে প্রকাশ করা হয়। কেউ ছবি এঁকে তার চিন্তা প্রকাশ করে। সে যা দেখে তা তুলি দিয়ে ছবি বানিয়ে অন্যকে দেখায়। কেউ পাথর খোদাই করে কোনো মূর্তি বানিয়ে তার চিন্তার প্রকাশ ঘটায়। নাচের মাধ্যমেও চিন্তা প্রকাশ করা হয়।

তাই ভাষা, সুর, অভিনয়, ছবি, খোদাই, নাচ ইত্যাদি হলো সংস্কৃতির বাহন। এসবের কাঁধে ভর করেই সংস্কৃতি প্রকাশ পায়।

আগেই বলা হয়েছে, সংস্কৃতির মূলভিত্তি হচ্ছে কতক বিশ্বাস। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কতক বিশ্বাস ছাড়া মানুষ মনকে বুঝ দিতে পারে না। যার বিশ্বাস যে রকম, তার সংস্কৃতি সে রকমই হতে বাধ্য।

তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করে তাদের মৌলিক বিশ্বাস যে রকম হয় ঐ অনুষ্ঠানে সে রকম সংস্কৃতিরই প্রকাশ ঘটে।

যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী তাদের গান, নাটক, ছবি, সাহিত্য, তাদের সবকিছু ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় বহন করবে। যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা কোন্ সংস্কৃতি।

বাঙালি সংস্কৃতি

দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে 'বাঙালি সংস্কৃতি' কথাটি শোনাা যায়। সংস্কৃতি কাকে বলে– এ বিষয়ে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সে হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতি কথাটি মোটেই যুক্তিপূর্ণ নয়। যারা এ কথাটি বলেন, তারা হয়ত না বুঝেই বলেন।

যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাদেরকে বাঙালি বলা হয়। বাংলা ভাষাভাষীদের সবার জীবনজগৎ সম্পর্কে মৌলিক বিশ্বাস এক রকম নয়। বাঙালি মুসলিম এবং বাঙালি হিন্দুদের মৌলিক বিশ্বাস আলাদা। তাই মুসলিম সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি কিছুতেই এক রকম হতে পারে না। তাহলে বাঙালি সংস্কৃতি বলে কোনো সংস্কৃতি থাকতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি বাঙালি হিন্দুদের সংস্কৃতি থেকে অবশ্যই আলাদা। বাঙালি হিসেবে উভয়ই পয়লা বৈশাখ পালন করে; কিন্তু পালন করার ধরনে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। যারা 'বাঙালি সংস্কৃতি' কথাটি বলেন, তারা চালাকি করে হিন্দু সংস্কৃতিকে বাঙালি সংস্কৃতি নামে চালিয়ে দিয়ে মুসলিম তরুণদেরকে মুসলিম সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চান। তাই দেখা যায়, বাঙালি সংস্কৃতির নামে অনুষ্ঠান করে সেখানে হিন্দু ধর্মের কতক প্রথাকেও বাঙালি সংস্কৃতির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক জীবন

কোনো দেশ বা রাষ্ট্র দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের সাথে সম্পর্ক কায়েম না করে আলাদা অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। অর্থনীতির আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি, মানুষের দরকারি সব জিনিস এক দেশেই পাওয়া যায় না। এ কারণে একটি দেশকে টিকে থাকার প্রয়োজনেই আরও অনেক দেশের সাথে বিভিন্ন জিনিসের আদান-প্রদান করতে হয়। কোনো এক দেশ অন্য দেশের সম্পদ দখল করার উদ্দেশ্যে সে দেশে হামলা করে বসে। ফলে যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে এক দেশের কতক সৈনিক অপর দেশের হাতে বন্দি হতে পারে। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে দুদেশের মধ্যে বন্দি-বিনিময় হয়ে থাকে। কোনো বড় দেশের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আশপাশের ছোট কয়েকটি দেশের মধ্যে ঐক্যের চুক্তি হয়ে থাকে। আরো অনেক উদ্দেশ্যেই এক দেশের সাথে আরেক দেশের চুক্তি হতে পারে। এভাবে এক দেশকে অনেক দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতেই হয়। এ সম্পর্ককেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা হয়। জাতিতে জাতিতে যে সম্পর্ক, এরই নাম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ককে এ নাম দেওয়া হয়। কারণ, রাষ্ট্রকে ভিত্তি করেই রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের ভিত্তিতে বাংলাদেশি জাতি, জাপানের ভিত্তিতে জাপানি জাতি, চীনের ভিত্তিতে চীনা জাতি ইত্যাদি। এসব জাতির মধ্যে যে সম্পর্ক একেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা হয়।

একটি ইসলামী রাষ্ট্র শুধু অন্যান্য ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্রের সাথেই নয়, অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথেও বিভিন্ন কারণে সম্পর্ক রাখতে পারে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। বাংলাদেশে অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত আছে। ঐসব দেশে বাংলাদেশেরও রাষ্ট্রদূত আছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যেসব আদান-প্রদান হয় তা রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমেই ব্যবস্থা করা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধরন

সাধারণত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

১. পণ্য-বিনিময়। এক দেশের উৎপন্ন পণ্য অন্য দেশে রফতানি করা হয়। এর বদলে ঐ দেশের পণ্য এ দেশে আমদানি করা হয়।

২. এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে চাকরি করতে যায়। রাষ্ট্রদূত এর ব্যবস্থা করে দেন। যেমন– বাংলাদেশের বহু লোক বিদেশে চাকরি করে।

৩. এক দেশের কোনো কোম্পানি অন্য দেশে কোনো কাজের দায়িত্ব নেয়। যেমন– বিদেশি কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে কোনো সেতু তৈরি করে, কারখানা কায়েম করে বা কোনো হাসপাতাল নির্মাণ করে দেয়। এর জন্য বাংলাদেশ ঐ কোম্পানিকে টাকা দেয়।

www.pathagar.com

৪. এক দেশের কোনো কোম্পানি অন্য দেশে ব্যবসায় করার জন্য তাদের পুঁজি লগ্নি করে। যেমন– বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশি কোম্পানি কাজ করে।

৫. দু'দেশের নির্দিষ্ট কোনো স্বার্থে চুক্তি হয়ে থাকে।

৬. দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার পর সন্ধি হলেও চুক্তি হয়ে থাকে।

এসব বিষয়ে ইসলামের বিধান হলো– ইসলামী সরকার সকল দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে। চুক্তির সব শর্ত মেনে চলবে। অন্যপক্ষ শর্ত ভঙ্গ না করা পর্যন্ত শর্ত পালন করবে। যদি কোনো কারণে চুক্তি বাতিল করতে হয়, তাহলে অপরপক্ষকে জানিয়েই তা করবে। গোপনে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

যুদ্ধ সম্পর্কে ইসলামী বিধান

ইসলাম সবসময় শান্তির পক্ষে। কোনো দেশের উপর ইসলামী রাষ্ট্র সামান্য যুলুমও যেন না করে। ইসলামী রাষ্ট্র গায়েপড়ে যুদ্ধ বাঁধাবে না। কিন্তু যদি ইসলামী রাষ্ট্রের উপর কোনো শক্তি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তাহলে ইসলাম যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলামী সৈন্য বাহিনীকে কিছু বিধান মেনে চলতে বাধ্য করে। যেমন–

১. শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরকে ছাড়া সাধারণ মানুষকে মারা নিষেধ।

২. যদি ব্যাপক মারামারি লেগে যায় তবুও মেয়ে, বুড়ো, শিশু, পঙ্গু, সাধু-সন্ন্যাসীদের হত্যা করা নিষেধ।

৩. শত্রুদেশের ফলের গাছ, খেতের ফসল ও মানুষের উপকারী কোনো সম্পদ ধ্বংস করা চলবে না, যেমন– রাস্তা, সেতু ইত্যাদি।

৪. যুদ্ধের কারণে শত্রুপক্ষের যেসব সৈন্য বা মানুষ মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে আসে, তাদের সাথে মানুষ হিসেবে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এরা এখন নিরুপায় বলে তাদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করা যুলুম।

৫. যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হচ্ছে–

ক. শত্রুপক্ষের হাতে মুসলিম সৈন্য বন্দি হয়ে থাকলে ঐ বন্দিদেরকে ফেরত আনার জন্য মুসলিমদের হাতে থাকা বন্দিদেরকে ফেরত দিয়ে বন্দি-বিনিময় করবে।

খ. শত্রুপক্ষ তাদের বন্দিদেরকে টাকার বিনিময়ে ফেরত নিতে পারবে।

এ সম্পর্কে সূরা মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার পর তোমরা ইচ্ছা করলে বন্দিদের প্রতি দয়া করবে অথবা ফিদ্ইয়া নিয়ে ছেড়ে দেবে।"

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি মুসলিমদের কর্তব্য

আমরা জানতে পারলাম, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু ধর্ম নয়। মানবজীবনের সব বিষয়েই ইসলাম বিধান দিয়েছে। তাই কোনো মুসলমান যদি ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনে ইসলামকে মেনে চলাই যথেষ্ট বলে ধারণা করে, তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। আল্লাহর কুরআন, রাসূল (স)-এর হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবন থেকে ঐ ধরনের ভুল ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই।

রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সবটুকুই ইসলাম। রাসূল (স) যা বলেছেন ও যা করেছেন তাই আসল ইসলাম। মদীনায় তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন; ঐ রাষ্ট্রের তিনিই ছিলেন সরকারপ্রধান। ঐ রাষ্ট্রে সব ব্যাপারেই তিনি আল্লাহর আইন জারি করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যেসব বিধান কুরআনে আছে, তা কি শুধু তিলাওয়াত করার জন্য? ঐসব বিধান কি নামায-রোযার মতো ফরয নয়? ইসলামের কোনো অংশ বাদ দেওয়ার কোনো অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। ইসলামের সবটুকু মেনে চলার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

মক্কার কুরাইশ নেতারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি ধ্বংস করার জন্য বদরের ময়দানে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। পরের বছর আরও বড় বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তারা উহুদের ময়দানে হাজির হলো। মদীনার মসজিদে রাসূল (স)-এর ইমামতিতে এক হাজার লোক ফজরের নামায আদায় করলেন। রাসূল (স) সবাইকে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহুদ ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জনকে ভাগিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে গেল। কুরআনে তাদেরকে ঈমানদার নয় বলে ঘোষণা করা হলো।

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হলো, নামাযে রাসূলের সাথী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে সাথী হতে রাজি না হওয়ায় তারা ঈমানের পরীক্ষায় ফেল করল। রাসূল (স)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর আসল উদ্দেশ্যই হলো ইসলামকে বিজয়ী করা। এ আসল কাজে যারা শরীক হয়নি, তারা নামাযে শরীক হওয়া সত্ত্বেও বেঈমান বলে সাব্যস্ত হলো।

রাসূল (স)-কে মূলত কী দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনের তিনটি সূরায় তিন বার ঘোষণা করেছেন। সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাত্হের ২৮ নং ও সূরা সাফ্-এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দীনে

www.pathagar.com

হক দিয়ে পাঠিয়েছেন; যাতে তিনি (এ দীনকে) অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" এ কথাটি যে সবচেয়ে জরুরি, তা বুঝানোর জন্যই একই কথা তিন-তিন বার ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর দীন বিজয়ী না হলে আল্লাহর কোনো ফরযই ঠিকমতো জারি হতে পারে না। তাই দীনকে বিজয়ী করার কাজটি সব ফরযের বড় ফরয। এ ফরয জারি হলে আল্লাহর দেওয়া সব ফরয সহজেই জারি হতে পারে। রাসূলকে শুধু নামায কায়েমের জন্য পাঠানো হয়নি; সবটুকু ইসলামকে বিজয়ী দীন হিসেবে কায়েম করতে পাঠানো হয়েছে।

তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক হলেই মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। যারাই ঈমানদার বলে দাবি করে, তাদের ঈমানের দাবি পূরণ করতে হলে দেশে মানুষের মনগড়া আইনের বদলে আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করতেই হবে। এ চেষ্টা করাটাই ঈমানদারদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এ কাজটিকে কুরআনে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়েছে।

যদি আমরা এ আসল দায়িত্বটি পালন না করি, তাহলে দেশে মানুষের মনগড়া আইনই চালু থাকবে। যতদিন তা চালু থাকবে ততদিন জনগণ রাজনৈতিক যুলুম ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবে না। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হলে আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানরা খাঁটি মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে না। ইসলামী পারিবারিক বিধানও ঠিকমতো চালু করা যাবে না। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, যৌতুক, যিনা, ধর্ষণ ইত্যাদি থেকে মানুষ নিস্তার পাবে না। তাই যারাই আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ও রাসূল (স)-কে একমাত্র নেতা বলে মেনে চলতে চায়, তাদেরকে আল্লাহর হক দীনকে বিজয়ী করার জন্য জান ও মাল দিয়ে চেষ্টা করতেই হবে।

জিহাদ

আরবী শব্দ 'জিহাদ' নির্গত হয়েছে 'জুহদ' থেকে, জুহ্দ মানে চেষ্টা। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ হলো বিরোধীশক্তির বাধা সত্ত্বেও চেষ্টা করতে থাকা।

কুরআনে বারবার হুকুম করা হয়েছে, 'আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর।' এর সহজ অর্থ হলো আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য জান ও মাল কুরবানী দিয়ে চেষ্টা করতে থাকা। এ চেষ্টার পয়লা কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দেওয়া। যারা দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে তোলার কাজটিও জিহাদ। এ কাজের যারা বিরোধী তাদের বাধা সহ্য করাও জিহাদ। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করাও জিহাদ। এ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যদি কোনো শক্তি আক্রমণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

যুদ্ধ করাও জিহাদ। নিজের জীবনে নাফসকে দমনের চেষ্টা করাও জিহাদ। অর্থাৎ আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা চালু করা ও যা অপছন্দ করেন তা উৎখাত করার জন্য যা কিছু করা হয় সবই জিহাদ।

সাধারণত মানুষ জিহাদ বললে যুদ্ধকেই বুঝে। কিন্তু কুরআনে যুদ্ধের জন্য আলাদা শব্দ 'কিতাল' ব্যবহার করা হয়েছে। কিতাল অর্থ একে অপরকে হত্যা করা। জিহাদ মানে কিতাল নয়। অবশ্য জিহাদের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার একপর্যায়ে যুদ্ধের স্তরও আসতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধও এক রকমের জিহাদ। কিন্তু জিহাদ বলতে শুধু যুদ্ধকে বোঝায় না। জিহাদের অর্থ অনেক ব্যাপক।

'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-এর বাংলা সহজ অনুবাদ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন করা। রাসূল (স) ইসলামকে কায়েম করার জন্য যা কিছু করেছেন সবই জিহাদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তাআলার মর্জিমতো চেষ্টা করতে থাকাই জিহাদ।

ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীসে জোর দিয়ে বলেছেন, যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করবে তার একটা বড় কর্তব্য হলো অন্য মানুষকে ভালো কাজ করতে আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। কুরআন-হাদীসে এ কর্তব্যের নাম দেওয়া হয়েছে, 'আম্‌র বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'।

রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখবে তার কর্তব্য হলো জোর করে তা বন্ধ করা। যার এ ক্ষমতা নেই, সে যেন কথা বলে তা বন্ধ করে। যার এ সাহসও নেই, সে যেন মনে মনে এ কাজের বিরোধী হয়। এটুকু সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।"

সমাজে যদি ব্যাপকহারে মন্দ কাজ চলতে থাকে, তাহলে এর কুফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। যেমন– কেউ যদি দুর্গন্ধের জিনিস বাড়িতে জমা করে তাহলে আশপাশের সবাই এর গন্ধে কষ্ট পাবে। তাই দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে হলে এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ জন্যই রাসূল (স) হুকুম দিয়েছেন, যদি কেউ কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে, সে যেন শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করে দেয়। এ শক্তি না থাকলে যে মন্দ কাজ করছে তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঐ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এ শক্তিও যদি না থাকে তাহলে ঐ কাজকে খারাপ মনে করতে হবে এবং ঐ কাজ বন্ধ করার জন্য মনে মনে উপায় তালাশ করতে হবে। এটুকুও যদি সে না করে তাহলে বোঝা গেল, তার ঈমানই নেই।

অন্য মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও পরামর্শ দেওয়া বড়ই লাভজনক কাজ। রাসূল (স) বলেছেন, "কেউ কোনো লোককে ভালো কাজের পথ দেখালে ঐ

www.pathagar.com

লোক কাজ করে যে সওয়াব পাবে এর সমান সওয়াব সেও পাবে।" অন্যকে ভালো কাজের জন্য তাগিদ দিলে নিজের মধ্যে সে কাজ করার আগ্রহ ও জযবা বাড়ে। ভালো কাজের মধ্যে সেরা কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা।

সূরা হা-মীম আস সাজদাহ'র ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ঐ লোকের কথার চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল 'অবশ্যই আমি মুসলিম'।"

সূরা নিসার ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা থেকে অংশ পাবে।"

সূরা মায়িদার ২ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে, "তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, কিন্তু গুনাহ ও সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।"

রাসূল (স) কীভাবে কাজ শুরু করেছিলেন?

রাসূল (স) যেমন নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং আল্লাহর সব হুকুমই পালন করার তরীকা বা নিয়ম শিখিয়েছেন, তেমনি ইসলামকে তিনি যে নিয়মে বিজয়ী করেছেন সেভাবেই এ বড় কাজটি করতে হবে।

প্রথমে তিনি জনগণকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলার দাওয়াত দিয়েছেন। সকল নবী ও রাসূল ঐ একই কথার দিকে ডাক দিয়েছিলেন।

সূরা আ'রাফের ৮ নং রুকু থেকে ১১ নং রুকু পর্যন্ত প্রতিটি রুকুর প্রথম আয়াতে হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ) ও হযরত শোয়াইব (আ)-এর নাম নিয়ে দেখানো হয়েছে যে, সব নবী একই কথা বলে মানুষকে ডাক দিয়েছেন। সে কথাটি হলো, "হে আমার কাওম (দেশবাসী)! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"

সহজেই মানুষ এ কথার মর্ম বুঝতে পারল। এ কথাটির মর্ম হলো, "তোমাদের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম করার অধিকার নেই। তোমরা যেমন মানুষ, যারা তোমাদের উপর হুকুম জারি করছে তারাও তেমন মানুষ। তোমাদের উপর তারা কেন মনগড়া হুকুম চালাবে? তোমরা ও তারা সবাই একমাত্র আল্লাহর হুকুমের গোলাম। তোমরা শুধু আল্লাহরই দাসত্ব কর।"

রাসূল (স)-কে মক্কাবাসী সকলেই সবচেয়ে সত্যবাদী ও ভালো মানুষ হিসেবে জানত। তিনি 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে

www.pathagar.com

দাওয়াত দিলেন তা খুবই চমৎকার, যুক্তিপূর্ণ ও অবহেলনীয় নয় বলে লোকেরা বুঝতে পেরেছিল। তাই তাঁর এ ডাকে মানুষের সাড়া দেওয়ারই কথা।

আবু জাহ্ল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানদের মতো নেতাদের হুকুমই তখন সমাজে চলছিল। তাদের শাসনই মক্কাবাসীরা মানত। রাসূল (স)-এর ঐ ডাকে মানুষ সাড়া দিলে তাদের নেতাগিরি খতম হয়ে যাবে। মানুষের উপর তাদের মনগড়া শাসন আর চলবে না। তাই এ দাওয়াত তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। রাসূল (স) এ কথা জানতেন ও বুঝতেন বলেই তিনি প্রথমে আপন ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে দাওয়াত দিয়েছিলেন। প্রায় তিন বছর এভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং বেশ কিছু লোক রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনে। আস্তে আস্তে ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে রাসূল (স) একদিন কাবা শরীফের পাশে সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদেরকে ডাক দিলেন। তাঁর মতো সম্মানিত লোকের ডাক শুনে ঐ নেতারাসহ অনেক মানুষ একত্রিত হয়। তখন তিনি বললেন, "আমি যদি বলি, পাহাড়ের অপর পাশে একদল দুশমন তোমাদের উপর হামলা করতে এসেছে, তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?" সবাই একসাথে আওয়াজ দিল, "তুমি বললে বিশ্বাস করব। কারণ, কোনো সময় তোমাকে কোনো মিথ্যা কথা বলতে আমরা শুনিনি।" তাঁর সত্যবাদী হওয়ার কথা সবাই স্বীকার করার পর তিনি তাঁর আসল দাওয়াত পেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ তিন নেতাসহ মক্কার সব বড় লোকেরা রাসূল (স)-কে গালি দিতে দিতে চলে গেল। জনগণ যাতে রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া না দেয়, সেজন্য তারা তাঁকে পাগল, জাদুকর, ক্ষমতালোভী বলে অপপ্রচার চালাল। যারাই ঈমান আনে তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন শুরু করল। অনেকেই ভয়ে ঈমান আনতে সাহস পেল না। দুবছর পর ৮৩ জন লোক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাসূল (স)-এর অনুমতি নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেলেন। শাসকরা এ ধরনের ব্যবহার সকল নবীদের সময়ই করেছে।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে দেশেই চেষ্টা করা হয়, সে দেশে যে শাসকদের মনগড়া আইন চালু আছে, সে শাসকরা বাধা দেবেই। কারণ, আল্লাহর আইন কায়েম হলে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে।

আমরা যদি নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করি, তাহলে আমাদেরকেও জনগণের নিকট ঐ দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যাবতীয় সুবিধা যারা ভোগ করছে, তারা এ দাওয়াতের বিরোধিতাই করবে। এর কোনো পরওয়া না করে আমাদেরকে অবশ্যই দাওয়াত দিতে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

রাসূল (স) মযবুত সংগঠন গড়ে তুললেন

রাসূল (স)-এর ডাকে যাঁরা সাড়া দিয়ে 'আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার হিম্মত করলেন, তিনি তাদেরকে নিজের নেতৃত্বে জামাআতবদ্ধ করলেন। তাঁদের মন-মগজ-চরিত্র গঠন করতে থাকলেন, যাতে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে মানুষের মনগড়া আইন ও শাসনকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে পারেন।

এ বিরাট কাজটি নবীর পক্ষেও একা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ কোনো অযোগ্য লোককে নবী-রাসূল হিসেবে পাঠাননি। কিন্তু তিনি যত যোগ্যই হন, একটা দেশের আইন ও শাসন বদলিয়ে দেওয়ার মতো বিরাট কাজ করতে হলে একদল এমন লোক দরকার, যারা নবীর নেতৃত্বে ঐ উদ্দেশ্যে জান দিতে প্রস্তুত। ১৩ বছরে রাসূল (স) এমন একদল লোকই তৈরি করলেন।

ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা দুটো শর্ত দিয়েছেন। প্রথম শর্ত হলো, এমন একদল লোক তৈরি করা। আরো একটা শর্ত রয়েছে– তা হলো, যে এলাকায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলে সেখানকার জনগণও এর পক্ষে থাকা। আর কোনো এলাকার জনগণ যদি এর সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে আল্লাহ তাদের উপর জোর করে দীনের নিয়ামত চাপিয়ে দেন না।

মক্কায় প্রথমে কাফির নেতাদের পক্ষে এবং ইসলামের বিজয়ের বিপক্ষে জনগণের সমর্থন থাকায় দ্বিতীয় শর্তটি সেখানে ছিল না। তাই প্রথম শর্তটি থাকা সত্ত্বেও মক্কায় তখন ইসলামকে বিজয়ী করা গেল না। তিন বছর আগে থেকে হজ্জের মৌসুমে মদীনার অনেক লোক 'মিনা'য় (মক্কার তিন মাইল দূরে) গোপনে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমান আনে। তাই আল্লাহর হুকুমে তিনি ইসলামী সরকার কায়েম করার উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করেন। মক্কার নেতারা রাসূল (স)-কে মেরে ফেলার জন্য যে রাতে তৈরি ছিল, সে রাতেই তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে নিয়ে গোপনে মক্কা থেকে বের হয়ে যান। মদীনার জনগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন

রাসূল (স) ১৩ বছরে মক্কা, মদীনা ও আরবের অন্যান্য জায়গায় যাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন, তাদেরকে নিয়েই মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন। তিনি ঐ সরকারের প্রধান হন। এরপর থেকেই আল্লাহর আইন ওহীর মাধ্যমে নাযিল হতে থাকে। আর নাযিলের সাথে সাথে প্রতিটি আইন চালু হতে থাকল। এভাবে ১০ বছরে সব আইন জারি হয়ে গেল।

মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েমের ৮ বছর পর বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় হয়। রাসূল (স)-এর জন্মভূমি মক্কা থেকে তিনি গোপনে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। আট বছর পরই রাসূল (স) এক বাহিনী নিয়ে বিনা বাধায় মক্কা জয় করেন। ২১ বছর পর্যন্ত যারা রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে চরম দুশমনি করেছে, এমনকি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও বারবার মদীনায় হামলা করেছে, সে দুশমনদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি মাফ করে দিলেন। দুশমন পরাজিত হলে প্রতিশোধ না নেওয়াই ইসলামের শিক্ষা। তিনি তাদেরকে হত্যা করতে পারতেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ায় তারা রাসূল (স)-এর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সবাই তাঁর প্রতি ঈমান এনে ইসলামের পতাকাতলে দীক্ষিত হলেন। তিনি তাঁদের অন্তরকে জয় করলেন। শাস্তি দিলে এমন মহান বিজয় হতো না। শত্রুকে বন্ধু বানানোই নবীর শিক্ষা।

বাংলাদেশে কি ইসলামের বিজয় সম্ভব?

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন মানুষ মুসলমান। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ইসলামী সরকার নেই বলে তারা খাঁটি মুসলিম হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না; কিন্তু তারা ইসলামের বিরোধী নয়। রাসূল (স)-এর জন্মভূমির জনগণ ইসলামের বিরোধী ছিল বলে তাঁকে মদীনায় হিজরত করতে হয়। আমাদেরকে হিজরত করতে হবে না।

ইসলামের বিজয়ের জন্য যে দুটো শর্ত রয়েছে, এর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশে আছে। জনগণ ইসলামের সমর্থক বলেই ইসলামবিরোধী দলও জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য নির্বাচনের সময় আল্লাহ-রাসূলের দোহাই দেয়। তাই বাংলাদেশে ইসলামের বিজয়ের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামের বিজয়ের জন্য প্রথম শর্তটি পূরণ হলেই এ দেশে ইসলামী সরকার কায়েম হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা সূরা আন্ নূরের ৫৫ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন– ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য একদল লোক তৈরি হলেই তিনি তাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেবেন।

লোক তৈরি করার দায়িত্ব তিনি নেননি। লোক তৈরি হলে ইসলামী সরকার কায়েম করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। রাসূল (স)-এর যুগে লোক তৈরির কাজ সমাধা হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ঐ তৈরিকৃত লোকদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দেন।

আমাদের আসল দায়িত্ব হলো ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ এতো বেশি সংখ্যায় লোক তৈরি করা, যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামী সরকার কায়েমের তাওফীক দান করেন। যাদের হাতে ক্ষমতা দিলে ইসলামকে বিজয়ী করতে পারবে, আমাদের এই বাংলাদেশে এমন একদল লোক তৈরি হলেই ইসলামী সরকার কায়েম হতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী সরকার মানে সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন

ইসলামী সরকার মানে ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন। সৎ লোক যদি যোগ্য না হয়, তাহলে তার সততা কোনো কাজেই আসে না। আর যোগ্য লোক যদি অসৎ হয়, তাহলে সে যোগ্যতার সাথেই অসৎ কাজ করে। তাই যদি সরকার এমন লোকদের হাতে থাকে, যারা সৎ ও যোগ্য, তবেই জনগণ সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারে।

সরকার বললে শুধু প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ ও এমপিগণই বোঝায় না, সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি মিলেই সরকার। কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ করার সময় শুধু যোগ্যতাই যাচাই করা হয়, সততা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক দলগুলো এমপি বানানোর জন্য যাদেরকে নমিনেশন দেয় তারাও যোগ্যতাকেই গুরুত্ব দেয়। তারাও সৎ লোক তালাশ করে না। নমিনেশন দেওয়ার সময় প্রার্থীর ধনবল ও জনবল দেখেই বাছাই করা হয়।

সৎ লোক বা ভালো মানুষ কাকে বলে? যে লোক গোপনেও খারাপ কাজ করে না, সে-ই সৎ লোক। সাধারণত মানুষ আইনের ভয়ে, পুলিশের ভয়ে ও লোকলজ্জার ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; কিন্তু ধরা পড়বে না বলে মনে করলে সুযোগ পেলেই মহাঅন্যায় করতেও পরওয়া করে না।

প্রত্যেক মানুষেরই বিবেক আছে। কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ, তা বিবেকের নিকট স্পষ্ট। যারা মন্দ কাজ করে তাদের বিবেক জানে যে, কাজটা মন্দ। তারা বিবেকের বিরুদ্ধেই চলে। নাফসের তাড়না ও দুনিয়ার লোভে তারা বিবেকের ধার ধারে না।

সৎ লোক তারাই, যারা বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না; তারা দুনিয়ার লোভকে ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে। এ ক্ষমতা তাদেরই থাকে, যারা আল্লাহকে ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে। এরই নাম ঈমান। ঈমান ছাড়া সততার গুণ সৃষ্টি হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো যদি ঈমানদার ও সৎ লোক তৈরি করে এবং সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে এমপি বানায়, আর সরকার যদি সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করে, তবেই ইসলামী সরকার কায়েম হতে পারে।

যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামী সরকার কায়েম করতে চায়, তারা ঈমানদার ও সৎ লোকদেরকে দলভুক্ত করে তাদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে এবং যোগ্য লোকদেরকে দলে শামিল করে তাদেরকে ঈমানদার ও সৎ বানানোর চেষ্টা করে। এভাবে চেষ্টা না করলে সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন আপনা-আপনিই কায়েম হতে পারে না। সরকার যতবারই বদল হোক, সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন ছাড়া জনগণের কপাল বদলাবে না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com